আপন ঘরে

প্রফুল্ল রায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

শ্রীউষারঞ্জন সরকার
পরম প্রীতিভাজনেষু

তেতালায় সুদীপার এই বিশাল ঘরটা এক কথায় চমৎকার। পুরু জয়পুরী কার্পেটে মেঝেটা মোড়া। ডিসটেম্পার-করা দেওয়ালের নীলাভ রঙ চোখকে আরাম দেয়। মাঝখানে ফোমের গদি বসানো সুদৃশ্য খাট। দেওয়াল কেটে আলমারি আর ওয়ার্ডরোব বসানো হয়েছে। আর আছে ফ্যাশনেবল বুক-কেস। সেটার মাথায় কাচ এবং পোর্সিলিনের দামী দামী কিউরিও। এক কোণে লেখাপড়ার কাজের জন্য টেবিল-চেয়ার। এ ছাড়া রয়েছে টেলিফোন, ছোট ডিনার ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে ঘরটার আকর্ষণ অন্য জায়গায়। পুব আর দক্ষিণ পুরোপুরি খোলা। পুবের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালে চোখে পড়বে একটা রাস্তা একেবারে সরলরেখায় সামনের দিকে চলে গেছে। ওদিকটা চিরকালই খোলা থাকবে। পুবের ঐ রাস্তাটা সুদীপাদের বাড়ির পাশ দিয়ে ডাইনে ঘুরে গেছে। সুদীপার ঘরের দক্ষিণের ব্যালকনিতে গেলে প্রথমেই তাদের বাগান আর লন চোখে পড়বে। তারপর কমপাউণ্ড ওয়াল। ওয়ালের পর সেই রাস্তাটা। রাস্তার ওপারে বিরাট মাপের একটা পার্ক। কাজেই দক্ষিণ দিকটাও কোন দিন বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই।

সেপ্টেম্বর মাস সবে পড়েছে। বাঙলা ক্যালেণ্ডারের হিসেবে আশ্বিন চলছে। আর কয়েকদিন বাদেই পুজো।

এখন সকাল। সুদীপার ঘরের দেওয়ালে ইলেকট্রনিক ঘড়িটায় আটটা বাজতে দশ। বাইরে গলানো গিনির মতো শরতের মায়াবী রোদের ঢল নেমেছে। লনের দেবদারু আর ইউক্যালিপ্টাস গাছের মাথায় ঝাঁক ঝাঁক পাখি অনবরত ডেকে যাচ্ছে।

অ্যাটাচ্‌ড বাথ থেকে স্নান সেরে এইমাত্র ঘরে এসে ঢুকল সুদীপা। তার হাঁটু পর্যন্ত এখন ধবধবে সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা।

প্রায় যান্ত্রিক নিয়মেই সুদীপার চোখ ওয়াল ক্লকটার দিকে চলে গেল। তারপর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সে ওয়ার্ডরোবের কাছে এল।

সুদীপার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ কিন্তু অতটা দেখায় না। মাঝারি হাইট। গায়ের রঙ কালোও না, ফর্সাও না। দুইয়ের মাঝামাঝি। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা রেশমের সুতোর মত ঘন নরম চুল থেকে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। ছোট্ট কপাল তার, ডিমের মতো লম্বাটে মুখ, ধারাল নাক, সরু কোমর এবং টান টান সুগোল হাত। ত্বক এমনই মসৃণ আর উজ্জ্বল যে মন হয়, শরীরের

ভেতর থেকে একটা স্নিগ্ধ আভা বেরিয়ে আসছে। বড় বড় দীর্ঘ চোখ দুটিতে শান্ত গভীর দৃষ্টি। তাকে ঘিরে এমন এক রুচি, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস আর মর্যাদাবোধের ছাপ রয়েছে যা সর্বক্ষণ তাকে অসাধারণ করে রাখে।

রোজই এই সময় স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ে সুদীপা। কিন্তু আজকের দিনটা অন্য সব দিন থেকে একেবারেই আলাদা। আজ দুপুরে মৃন্ময়কে জানিয়ে দেবে তার কথায় সে রাজী। পুজোর পর যেদিনই বিয়ের তারিখ ঠিক হোক, সুদীপার আপত্তি নেই। এ ব্যাপারে মনঃস্থির করতে পাঁচটা বছর সময় লেগেছে তার। অথচ মৃন্ময় অসাধারণ ব্রাইট ছেলে। শিক্ষিত, সুপুরুষ, কৃতী। 'সাকসেসফুল ম্যান' বলতে যা বোঝায়, সে তা-ই। চল্লিশের নীচে বয়স, কিন্তু এর মধ্যেই জীবনে সব দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত। কোথাও কোন খুঁত নেই মৃন্ময়ের। তবে বাধাটা ছিল সুদীপার নিজের মধ্যেই। বাধা বলতে দ্বিধা, সংশয় এবং এক ধরনের ভয়ও। সে সব কাটিয়ে উঠতে পাঁচটা বছর লেগে গেল তার। আর এই পাঁচ বছরে একদিনের জন্যও অসহিষ্ণু হয় নি মৃন্ময়, ধৈর্য হারায় নি। গভীর সহানুভূতি নিয়ে অপেক্ষা করে গেছে। কিন্তু মৃন্ময়ের কথা পরে।

কাল রাত্তিরে বাবা আর ঠাকুমাকেও নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে সুদীপা। দু'জনেই খুব খুশী হয়েছেন। এ জন্য ওঁরাও অনেক দিন থেকেই উন্মুখ হয়েছিলেন। বাবা আর ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ নেই তার।

এস্রাজে মৃদু ছড় টানার মতো আজ ভোরে ঘুম ভাঙার পর থেকেই সুদীপার বুকের গভীরে অবিরাম কী যেন বেজে যাচ্ছে। বড় ভাল লাগছে তার।

আস্তে আস্তে ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে ফেলল সুদীপা। হ্যাঙ্গারে শাড়ি, ট্রাউজার্স, সালোয়ার, কামিজ, চুস্ত, হাউসকোট, কাপ্তান, ম্যাক্সি—এমনি নানা ধরনের 'অগুনতি' পোশাক ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে একটা নতুন জীনস্ আর শার্ট বার করল সে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুদীপা প্রথমে যাবে ক্যামাক স্ট্রীটে তাদের অফিসে। লাঞ্চ ব্রেক পর্যন্ত কাজ করার পর মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখা হবে। তার যে ধরনের কাজ তাতে শাড়িটাড়িতে ভীষণ অসুবিধা। ট্রাউজার্স বা সালোয়ারে অনেক ফ্রী লাগে।

আচমকা পেছন থেকে কার গলা ভেসে এল, 'রঞ্জু—'

সুদীপার আদরের নাম, রঞ্জু। ঐ নামেই বাবা আর ঠাকুমা তাকে ডাকেন। ইদানীং দু'একবার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে মৃন্ময়ের মুখেও ওটা শোনা গেছে।

মুখ ফিরিয়ে তাকাল সুদীপা। দূরে দরজার কাছে ঠাকুমা হেমনলিনী

দাঁড়িয়ে আছেন। আশির কাছাকাছি বয়স কিন্তু এখনও পিঠ বেঁকে যায় নি। গায়ের রঙ একসময় ছিল স্বর্ণাভ। কুঁচকে কুঁচকে চামড়া এখন সোনার জালি হয়ে গেছে। যৌবনে মারাত্মক রূপসী ছিলেন। ধ্বংসাবশেষ যেটুকু আছে, তাতেও চোখ ফেরানো যায় না। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা ধবধবে সাদা চুল। পরনে দুধ-রঙ গরদ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে।

সুদীপা অবাকই হয়ে গেল। এই সকালবেলায় ঠাকুমা কখনও তেতলায় তার ঘরে আসেন না। উনি আর বাবা এ সময়টা একতলার ডাইনিং রুমে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সুদীপা ব্রেকফাস্ট করে না বেরুনো পর্যন্ত ওঁরা সেখানে বসে তাকে সঙ্গ দেন।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে ঠাকুমা?'

হেমনলিনী বললেন, 'নিশ্চয় কমু। তর হাতে ঐগুলান কী? সাহেবগো জামা-পেন্টুল না?' দেশ ভাগের অনেক আগে সেই নাইনটীন ফর্টিওয়ানে পূর্ব বাঙলা থেকে চলে এসেছিলেন তিনি। তারপর পুরো চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু এতদিনেও এপার বাঙলার ভাষাটা কিছুতেই রপ্ত করতে পারলেন না। তাঁর জিভে ফরিদপুর জেলাটা এখনও অনড় হয়ে আছে। শাড়ি-ধুতি বাদে তাঁর কাছে আর সব কিছুই সাহেব-মেমদের পোশাক।

হেমনলিনীর বলার ভঙ্গি নকল করে রগড়ের গলায় সুদীপা বলল, 'হ, সাহেবগো জামা-পেন্টুল।'

'আমি জানতাম এইগুলি পইরা তুই আইজও বাইর হবি। তাই উপরে উইঠা আইলাম।' হেমনলিনী বলতে লাগলেন, 'আইজ এমুন একটা দিন! পুরুষের পোশাক পইরা মাইয়া মাইনষে (মেয়েমানুষে) কি মনের কথা কইতে পারে? শাড়ি পইরা যা দিদি।'

মজা করে একটু হাসল সুদীপা। বলল, 'কেন, মেমসাহেবরা লাভারদের কাছে মনের কথা বলে না? তখন কি তারা শাড়ি পরে নেয়!'

'ওরা হইল গিয়া মেম। ওগো কথা ভিন্ন। যতই লিখাপড়া শিখা পুরুষগো লগে পাল্লা দাও, মনে রাইখো তুমি বাঙালী ঘরের মাইয়া। জামা-পেন্টুল রাইখা শাড়ি বাইর কর। আর এইগুলা ধর—' বলে একটা কারুকাজ-করা চমৎকার রুপোর বাক্স বাড়িয়ে দিলেন।

বাক্সটা যে হেমনলিনীর হাতে ছিল, আগে লক্ষ্য করেনি সুদীপা। সে জিজ্ঞেস করল, 'এর ভেতরে কী আছে?'

'খুইলা দ্যাখ না!'

কাছে এগিয়ে এসে বাক্সটা নিল সুদীপা। ঢাকনাটা খুলতেই চোখে পড়ল অজস্র গয়না। বেশির ভাগই হীরের। অবাক হয়ে সে বলল, 'এসব দিয়ে কী

হবে?'

হেমনলিনী গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোর মায়ের জিনিস, আইজ এগুলা পইরা যাবি।'

সেই কোন ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে সুদীপা। তখন তার বয়স পাঁচ কি ছয়। পানপাতার মতো একটি মুখ, প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ, হীরের নাকছাবি, নকশাদার তাঁতের শাড়ি, কাঁধে বড় চাবির গোছা—এটুকু ছাড়া মায়ের আর সব স্মৃতিই ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে এ বাড়িতে তাঁর প্রচুর ফোটো আছে। একেক সময় মায়ের ছবির সামনে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সুদীপা।

ঠাকুমার মুখে মায়ের কথা শুনে মনটা একটুক্ষণ ভারী হয়ে রইল। তারপর সুদীপা বলল, 'তুমি ভেবেছ কি বুড়ী, গাঁইয়া মেয়েদের মতো আমি এসব পরে সং সাজব!'

'আ লো মাইয়া, মনের ভিতর উৎসব থাকলেই হয় না, সাজে-পোশাকে ঠাটে-ঠমকে তারে ফুটাইয়া তুলতে হয়। না হইলে মৃন্ময় বুঝব কেমনে?'

'মৃন্ময়ের জন্যে নিজেকে গয়নার শো-কেস বানিয়ে তুলতে হবে! প্লীজ ঠাকুমা, এ আমি পারব না।'

'সব না পরস, দুই-একখান পরতেই হইব।'

'কিন্তু—'

হেমনলিনী বললেন, 'আমি আর কোন কথা শুনুম না।'

সুদীপা বলল, 'প্লীজ ঠাকুমা, একটা কথা শুনতেই হবে।'

'কী?'

'এইসব গয়না-ফয়না পরে গেলে অফিসের এমপ্লয়ীরা কী ভাববে? কোনদিন তো সেজে-ফেজে যাই নি। আমার লজ্জা করছে।'

'কেউ কিচ্ছু ভাবব না। মনিবরে পরীর সাজে দেখলে আনন্দে তোর কর্মচারীরা তিন দিনের কাম একদিনে কইরা দিব।'

'একদম ইয়ার্কি করবে না ঠাকুমা! আমাকে ঝামেলায় ফেলে মজা করতে খুব ভাল লাগছে, না?'

'হুঁ।' ঘাড় কাত করে দিলেন হেমনলিনী, 'আমি নীচে খাওয়ার ঘরে যাই; তুই বেশি দেরি করিস না।' হাসতে হাসতে তিনি চলে গেলেন।

আর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুদীপা আবার ওয়ার্ডরোবের কাছে চলে এল। এবার জামা-কাপড়ের স্তূপের ভেতর থেকে একটা মেরুন রঙের মাইশোর সিল্কের শাড়ি আর ম্যাচ-করা ব্লাউজ বার করে পরে ফেলল। তারপর রুপোর বাক্সটা খুলে তাকিয়ে রইল। এত সব গয়না তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ পর একটা হীরের লকেটওলা সরু সোনার চেন

তুলে গলায় পরল। বাঁ হাতের আঙুলে পরল মুক্তো বসানো একটা আংটি, ডান হাতে পল-কাটা একটা রুলি, আর বাঁ হাতে একটা ইলেকট্রনিক ঘড়ি।

শাড়ি গয়না-টয়না পরা হয়ে গেলে সুদীপা ড্রেসিং টেবিলের মুখোমুখি একটা কুশনে গিয়ে বসল। ওভাল শেপের দামী বেলজিয়ান আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। আর সেই মুগ্ধতার মধ্যেই হেয়ার টনিক মেখে চুলগুলো ব্রাশ করল, আই লাইনার দিয়ে দীর্ঘ চোখ দুটো আরো আকর্ষণীয় করে তুলল। তুই ভুরুর মাঝখান থেকে একটু ওপরে কপালে সবুজ একটা টিপ আঁকল। তারপর ঠোঁটে হাল্‌কা রঙ লাগিয়ে নেল পলিশ দিয়ে নখগুলোকে চকচকে করে তুলল। তারও পর পাফ বুলিয়ে বুলিয়ে মুখে ফেস পাউডার মেখে শাড়ি এবং জামায় দামী ফরেন সেন্ট স্প্রে করে ডিভানের ওপর থেকে লেডীজ হ্যাণ্ডব্যাগটা তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এ বাড়ির তেতলায় থাকে সুদীপা, দোতলাটা হেমনলিনীর আর একতলায় সুদীপার বাবা উমাপ্রসাদ থাকেন। দু'দুবার করোনারি অ্যাটাক হয়ে যাবার পর তাঁর সিঁড়ি ভাঙা বারণ। ডাক্তারের পরামর্শে তাই তাঁকে একতলাতেই থাকতে হয়। এ বাড়ির তিন জেনারেশন তিনটে ফ্লোরে থাকে।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ডাইনিং রুমে এসে সুদীপা দেখল উমাপ্রসাদ আর হেমনলিনী বসে আছেন। হেমন্ত এবং কার্তিক একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মধ্যবয়সী হেমন্ত এ বাড়িতে রান্নার কাজ করে, কার্তিক তার ভাইপো এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট। ছেলেটার বয়স কুড়ি-বাইশ।

ডাইনিং রুমের গায়েই কিচেন। হেমন্ত আর কার্তিক সুদীপাকে দেখে একরকম দৌড়েই সেখানে চলে গেল এবং পাঁচ মিনিটের ভেতর প্লেটে খাবার সাজিয়ে ফিরে এল।

সুদীপার জন্য রোজই প্রায় এক এক ধরনের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। দুটো ডিমের পোচ, দুটো বাটার টোস্ট, দুটো জেলি মাখানো টোস্ট, এক গেলাস দুধ আর যখন যে ফল পাওয়া যায় তার কয়েকটা টুকরো। উমাপ্রসাদের এসব চলে না। দু' দুটো স্ট্রোক হয়ে যাবার পর তাঁর চলাফেরা, ওঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া—সব কিছুতেই এখন দারুণ কড়াকড়ি। ডাক্তার তাঁর জন্য যে চার্ট করে দিয়েছেন তার বাইরে একটা পা-ও ফেলার উপায় নেই। তাঁর ব্রেকফাস্ট হল মাখন ছাড়া দু'টুকরো স্যাঁকা রুটি, সরতোলা এক কাপ দুধ, দু'টুকরো শসা আর দু'টুকরো পেঁপে। হেমনলিনী এখানকার কিছুই ছোঁন না। তাঁর খাওয়া-দাওয়া এবং রান্নাবান্নার ব্যবস্থা দোতলায়। একবেলা খান;

নিজেরটা নিজেই রেঁধে নেন। তবে নাতনী এবং ছেলের খাওয়ার সময় তিনি কাছে এসে বসবেনই। দু'জনকে সামনে বসে না খাওয়ালে তাঁর তৃপ্তি নেই।

খেতে খেতে সুদীপা বলতে লাগল, 'বাবা, তুমি দশটা আর একটায় ট্যাবলেটগুলো খেয়ে নিও। ঠিক সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ করবে।' রোজ এই সময়টা উমাপ্রসাদ কখন কী ওষুধ খাবেন, ক'টায় লাঞ্চ করবেন, ক'টায় চা খাবেন, সব একবার করে বলে দিয়ে যায় সুদীপা। স্ট্রোক হবার পর থেকে বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে সব সময় সতর্ক থাকে।

সুদীপা আরো কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে উমাপ্রসাদ হেসে হেসে বললেন, 'রোজ শুনে শুনে রুটিনটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এ নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। এখন দরকারী কথাটা মন দিয়ে শোন—'

উমাপ্রসাদ কী বলবেন, সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল সুদীপা। মুখ নামিয়ে বলল, 'কী?'

'মৃন্ময়কে আজ সঙ্গে করে নিয়ে আসিস। রাত্তিরে এখান থেকে ও খেয়ে যাবে।'

মুখ না তুলে আস্তে করে সুদীপা বলল, 'বলব।'

বিশাল ডাইনিং টেবিলের শেষ প্রান্ত থেকে হেমনলিনী বলে উঠলেন, 'মৃন্ময়কে ক'বি (বলবি), আমরা কইলাম দেরি করুম না। আশ্বিন আর কার্তিক, এই দুই মাসে বিয়া নাই। অঘ্রাণ মাসে পরথম যেদিন তারিখ পামু সেইদিনই শুভকাম চুকাইয়া ফালামু।'

সুদীপা উত্তর দিল না।

ব্রেকফাস্টের পর উমাপ্রসাদকে প্রণাম করল সুদীপা। বলল, 'আমি যাই বাবা।'

তার মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত রেখে আধফোটা গলায় উমাপ্রসাদ বললেন, 'সাবধানে যাবি।'

বাবার পর ঠাকুমাকে প্রণাম করল সুদীপা। হেমনলিনী গভীর আন্তরিক গলায় বললেন, 'চিরসুখী হও দিদি।'

সুদীপা আর দাঁড়াল না। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে বড় বড় পা ফেলে সামনের পোর্টিকোর দিকে চলে গেল। ওখানে নতুন মডেলের ঝকঝকে একটা টোয়োটো নিয়ে শোফার অপেক্ষা করছে।

উমাপ্রসাদ আর মেয়ের সঙ্গে এলেন না; নিজের বেডরুমের দিকে চলে গেলেন। তবে হেমনলিনী সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এলেন। রোজই তিনি সুদীপাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে যান।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কী ভেবে ঘুরে দাঁড়াল সুদীপা। কিছুটা উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'ঠাকুমা, আমি ভুল করতে যাচ্ছি না তো?'

প্রবলবেগে দু' হাত নাড়তে নাড়তে হেমনলিনী বললেন, 'না-না, কোন ভুল হইব না। মনে আনন্দ লইয়া যা।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'তুমি তো সবই জানো।'

'জানি দিদি।'

'কোন অন্যায় হয়ে যাচ্ছে না তো?'

গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে হেমনলিনী উচ্চারণ করলেন, 'না—না—না—'

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না সুদীপা। আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠে ব্যাক সীটে বসে দরজা বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শোফার স্টার্ট দিয়ে জাপানী টোয়োটোটাকে পোর্টিকোর তলা থেকে বাইরে বার করে আনল।

বাড়ির সামনের দিকে অনেকখানি জায়গা। জায়গাটাকে সমান দুটো ভাগ করে এক ধারে লন, আরেক ধারে বাগান বানানো হয়েছে। মাঝখানে নুড়ি বিছানো রাস্তা।

লনে সবুজ কার্পেটের মতো ঘাস। সেখানে ক'টা রঙীন গার্ডেন আমব্রেলা আর একটা দোলনা রয়েছে। বাঁ দিকের বাগানে দেশী-বিদেশী নানা মরসুমী ফুলের গাছ। একটা মালী এই মুহূর্তে সেখানে বড় কাঁচি দিয়ে গাছের মরা হলদেটে পাতা ছেঁটে দিচ্ছে।

নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে সুদীপার টোয়োটোটা এক সময় সামনের বিরাট লোহার গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে নামল।

।। দুই ।।

আরো কুড়ি মিনিট বাদে ক্যামাক স্ট্রীটের প্রকাণ্ড একটা হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের কাছে এসে শোফার গাড়ি থামল। তারপর দ্রুত নেমে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে একধারে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রইল। রোজই এভাবে দরজা খুলে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্যাক সীট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সুদীপা। অভ্যাসবশতঃ বাঁ হাতের কব্জী উল্টে একবার ঘড়িটা দেখে নিল। ন'টা বাজতে পাঁচ। ঘড়ি না দেখলেও মোটামুটি সময়টা বলে দিতে পারত সে। কেননা রোজই ন'টা বাজার দু'চার

মিনিট আগে-আগেই সুদীপা এখানে চলে আসে। গত আট বছরে আট-দশ দিন বাদ দিলে এ নিয়মের কখনও হেরফের হয় নি।

সুদীপা আর দাঁড়াল না; ধীরে পা ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে মনে হল, ভোর থেকে বুকের ভেতর যে এস্রাজটা বাজছিল, এখন কেউ যেন তাতে দ্রুত ছড় টেনে যাচ্ছে। সুখানুভূতির মতো এক ধরনের উত্তেজনা যেন সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে খানিকটা নার্ভাসনেসও।

পনের-কুড়ি ফুট দূরে টাইলস বসানো অনেকগুলো সিঁড়ি। সেগুলো ভেঙে ওপরে উঠলেই বিরাট বাড়িটার মেইন এনট্রান্স। সিঁড়ির মাথা থেকে লম্বা করিডর চলে গেছে। তার একপাশে পর পর ছ'টা লিফট। সুদীপা একটা লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল। আর তার শোফার বাঁ দিকের ড্রাইভওয়ে দিয়ে টোয়োটো গাড়িটাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং এরিয়ায় নিয়ে গেল।

লিফটম্যান বাইরে টুলে বসে ছিল। সুদীপাকে দেখে সে হাঁ হয়ে গেল। তার বিস্ময়ের কারণ আছে। আট বছরে সে সুদীপাকে কোনদিন শাড়ি বা গয়না-টয়না পরে আসতে দেখে নি।

যাই হোক, বিস্ময়টা একটু থিতোলে লাফ দিয়ে উঠে লিফটম্যান দরজা খুলে দিল। সুদীপা ভেতরে ঢুকতেই সে টেনথ্ ফ্লোরের বোতাম টিপল। এই বিল্ডিংয়ের সব লিফটম্যানই জানে, রোজ ন'টার মধ্যে এসে সুদীপা কোন্ ফ্লোরে যায়?

ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে লিফটটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। লিফটম্যানের দিকে না তাকালেও সুদীপা টের পেতে লাগল, আড়ে আড়ে ছোকরা তাকে লক্ষ্য করছে। মনে মনে একটু লজ্জা পেল সে।

এই একুশতলা হাই-রাইজ বিল্ডিংটায় কয়েকশো অফিস রয়েছে। ব্যাঙ্ক, ট্র্যাভেল এজেন্সী, ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কনসার্ন, অ্যাডভারটাইজমেন্ট ফার্ম, ইত্যাদি ইত্যাদি।

টেনথ্ ফ্লোরের অর্ধেকটা, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার হাজার স্কোয়ার ফুট জুড়ে সুদীপাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অফিস। নাম 'নবজীবন হাউসিং কনসার্ন'। এদের কাজ হল ক্লায়েন্টদের জন্য বাড়ির প্ল্যান করা, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সেগুলো পাস করানো, তারপর সাইটে গিয়ে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া। সিনেমা হল, মাল্টি-স্টোরিড অফিস বিল্ডিং, প্রাইভেট বাংলো থেকে শুরু করে কো-অপারেটিভের ফ্ল্যাট পর্যন্ত সবই ওরা তৈরি করে দেয়। ইদানীং কলকাতা এবং আশেপাশে নিজেদের উদ্যোগে জমি যোগাড় করে বাড়ি বানিয়েও বিক্রি করছে।

'নবজীবন হাউসিং কনসার্ন' অবশ্য সুদীপার বাবা উমাপ্রসাদ মিত্রের ফার্ম। মানুষটি খুবই দূরদর্শী। তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর আগে যখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। অ্যাডভোকেট হিসেবে বেশ নামও করছিলেন, পশারও জমে উঠেছিল। এই সময় হঠাৎ দেশ ভাগ হয়ে গেল। পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ডারের ওপার থেকে জলস্রোতের মতো মানুষ আসতে লাগল এপারে। শুধু কি পূর্ব বাঙলা থেকে, ইণ্ডিয়ার অন্য সব প্রভিন্স থেকেও জলস্রোতের মতো হুড়হুড় করে মানুষ এসে কলকাতা এবং চারপাশের শহরতলী বোঝাই করে ফেলতে লাগল। উমাপ্রসাদ তখনই বুঝেছিলেন, এ শহরে পরের একশো বছর ধরে যে সমস্যা সব চাইতে তীব্র হয়ে উঠবে তা হল মানুষের মাথা গোঁজার সমস্যা। পপুলেশন এক্সপ্লোসেন অর্থাৎ জন-বিস্ফোরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বছরে হাজার হাজার টেনেমেন্ট আর বাড়ি তৈরি করতে না পারলে কলকাতা একেবারে 'কোলাপ্স' করে যাবে। হাইকোর্ট ছেড়ে তিনি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের ফার্ম খুলে বসলেন।

বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা অনেক বুঝিয়েছিলেন, জমজমাট প্র্যাকটিস ছেড়ে মধ্যবয়সে অনিশ্চিত ব্যবসার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। উমাপ্রসাদ কারো কথা শোনেন নি। তাঁর মধ্যে চিরকালই একটা একরোখা আডভেঞ্চারার রয়েছে। যেটা একবার মাথায় ঢুকবে তার শেষ না দেখে ছাড়বেন না।

উমাপ্রসাদ যে ভুল করেন নি, তাঁর দূরদৃষ্টি যে পরিষ্কার ছিল তার প্রমাণ হাতেনাতেই পাওয়া গেল। দু'বছরও লাগল না, কমস্ট্রাকশনের বিজনেস দারুণ জমে উঠল। প্রথমে নিজেদের বাড়ির একতলাতেই দু'খানা ঘর নিয়ে ছোট করে অফিস খুলেছিলেন। কিন্তু তিন বছরের মাথায় কাজের চাপ এত বেড়ে গেল যে দুটো ঘরে আর কুললো না। চার কামরার একটা অফিস ভাড়া করে অফিস উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু সেখানে দু' বছর যেতে না যেতেই আরো বড় অ্যাকোমোডেশনের দরকার হয়ে পড়ল। এইভাবে তেত্রিশ বছরে বার ছয়েক ঠিকানা বদলে 'নবজীবন হাউসিং কনসার্নে'র অফিস ক্যামাক স্ট্রীটের এই হাইরাইজ বিল্ডিংয়ে এসে উঠেছে।

উমাপ্রসাদের বুদ্ধি, পরিকল্পনা, সংগঠনের ক্ষমতা এবং পরিশ্রমে এই কনসার্ন বড় হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু ক'বছর ধরে তিনি অফিসে আসতে পারছেন না। দু' দুটো বড় রকমের স্ট্রোক তাঁকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। ডাক্তাররা তাঁর জন্য যে ছক কেটে দিয়েছেন, তার বাইরে একটা পা ফেলারও উপায় নেই। সকাল-বিকেল লেকের ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে আসা ছাড়া

বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ। শারীরিক বা মানসিক কোনরকম পরিশ্রমই তাঁকে করতে দেওয়া হয় না। কেননা সামান্য উত্তেজনাও উমাপ্রসাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাই অফিস বা বাড়ির সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে তাঁকে দূরে রাখা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে যে চার্ট করে দেওয়া হয়েছে, যান্ত্রিক নিয়মে উমাপ্রসাদ তা মেনে চলেন। না চলে উপায়ই বা কি? বাকি জীবন এইভাবেই তাঁকে কাটাতে হবে।

কাজেই অফিসের যাবতীয় দায়িত্ব নিতে হয়েছে সুদীপাকে। সেই সঙ্গে বাবার শরীর-স্বাস্থ্য এবং বাড়ির নানা খুঁটিনাটির দিকেও নজর রাখতে হয়। কিন্তু এ সব কথা পরে।

একটানা আওয়াজ করে লিফ্‌টটা টেনথ্ ফ্লোরে এসে থেমে গেল। বাইরে বেরিয়ে করিডর ধরে কয়েক পা গেলেই 'নবজীবন হাউসিং কনসার্নে'র অফিস। ডিসটেম্পার-করা ঝকঝকে দেওয়ালে পেতলের প্লেটে এনগ্রেভ করে ইংরেজিতে কোম্পানির নাম লেখা রয়েছে।

দরজার মুখে ইউনিফর্ম-পরা মধ্যবয়সী বেয়ারা বসে ছিল। সুদীপাকে দেখেই অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্তে'—বলেই লিফ্‌টম্যানের মতো তার চোখের তারাও বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল। লিফ্‌টম্যানটার মতো সে-ও সুদীপাকে এরকম সাজপোশাকে কখনও দ্যাখে নি।

চোখের কোণ দিয়ে বেয়ারাটাকে দ্রুত এক পলক দেখে নিল সুদীপা। তার না-কামানো গালে একদিনের দাড়ি, আধময়লা উর্দি, ট্রাউজার্সের ক্রীজগুলো ভাঙাচোরা, জুতোয় পালিশ নেই।

প্রতিটি বেয়ারাকেই অফিস থেকে ইউনিফর্ম এবং বুট দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে কাচাবার খরচ এবং জুতোর কালি। নোংরা পোশাক, পালিশ ছাড়া জুতো বা না-কামানো মুখ দেখলে সুদীপার রক্তচাপ বেড়ে যায়। শুধু বেচারা-টেয়ারাদের ব্যাপারেই না, নবজীবন হাউসিংয়ের অন্য এমপ্লয়ীদেরও কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে, অফিসে ময়লা পোশাকে আসা চলবে না। এখানে চাকরি পেতে হলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তো চাই-ই, সেই সঙ্গে ক্যাণ্ডিডেটের পরিচ্ছন্নতা, ডিসিপ্লিন এবং পাংচুয়ালিটি সম্পর্কে লিখিত আণ্ডারটেকিং দিতে হয়। অবশ্য এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যা মাইনে দেওয়া হয়, সুদীপা তার দেড় গুণ দিয়ে থাকে। তার মতে এমপ্লয়ীদের খুশি রাখলে তারা কোম্পানির ইন্টারেস্ট দেখবে। কোনো কিছুই একতরফা হয় না।

অন্য দিন হলে ঢোকার মুখে এমন অপরিচ্ছন্ন চেহারায় বেয়ারাকে দেখে

ক্ষেপে যেত সুদীপা। কিন্তু আজ ভেতরে ভেতরে সেই লজ্জাটা কাজ করছে। 'নমস্তে' বলেই সে ভেতরে ঢুকে গেল।

সাড়ে চার হাজার ফুটের পুরো অফিসটাই দামী জয়পুরী কার্পেট মোড়া। হাল্কা সবুজ রঙের ডিসটেম্পার-করা দেওয়ালে নামী আর্টিস্টদের সুন্দর সব পেন্টিং। আর আছে নানা ডিজাইনের সব বাড়ির ফোটো। এই সব বাড়ি 'নবজীবন হাউসিং কনসার্ন' তার ক্লায়েন্টদের তৈরি করে দিয়েছে। গোটা অফিসটাই এয়ার-কণ্ডিশানড।কাজেই মাথার ওপরে ফ্যান নেই। আলোর ব্যবস্থাও চমৎকার। কোথাও ব্যাল্ব বা টিউবলাইট দেখা যাচ্ছে না। তবে দেওয়াল বা সিলিংয়ের আড়াল থেকে পর্যাপ্ত আরামদায়ক আলো ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসছে।

গোটা অফিসটা পার্টিশান ওয়াল তুলে তুলে নানা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা। প্যারাবোলার আকারের কাঠের সব ফলকে সুদৃশ্য হরফে কোথাও লেখা আছে 'প্ল্যানিং সেল', কোথাও 'ডিজাইন সেকশন' কোথাও 'অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট', কোথাও 'কনফারেন্স রুম' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া টপ লেভেলের একজিকিউটিভদের জন্য আলাদা আলাদা চেম্বার। কার চেম্বার কোনটা, দরজার মাথায় নেমপ্লেট দেখে বোঝা যায়। গোটা অফিসটা সুদীপার পরিকল্পনা অনযায়ী সাজানো হয়েছে।

ডিজাইন সেকশনের পাশেই সুদীপার চেম্বার। নেমপ্লেটে লেখা আছে ঃ সুদীপা মিত্র। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অ্যাণ্ড প্রিন্সিপ্যাল আর্কিটেক্ট।

এত বড় অফিসটা এখন একেবারেই ফাঁকা। এখানে ডিউটি আওয়ার্স সাড়ে ন'টা থেকে পাঁচটা। মাঝখানে এক ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক। সাড়ে ন'টা বাজতে এখনও সাতাশ-আটাশ মিনিট বাকি।

নরম কার্পেটে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিজের চেম্বারে চলে এল সুদীপা। প্রকাণ্ড ঘরটার মাঝখানে গ্লাস-টপ সেমি-সার্কুলার টেবিল। টেবিলের একধারে নানা রঙের চার-পাঁচটা টেলিফোন। আরেক ধারে সুন্দর করে সাজানো অগুনতি ফাইল, রাইটিং প্যাড, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরি, পেন-হোল্ডার ইত্যাদি। আর আছে কাচের সুদৃশ্য স্ট্যাণ্ডে একটা আলট্রা-মডার্ন সিনেমা হলের মডেল। আর্কিটেকচারের দিক থেকে মডেলটা চমকে দেবার মতো।

টেবিলের এধারে দেড় ফুট ফোম-বসানো রিভলভিং চেয়ার। ওটা সুদীপার।সামনের দিকে ভিজিটরদের জন্য আরো দশখানা চেয়ার রয়েছে।

রিভলভিং চেয়ারের পেছনে ঝকঝকে দেওয়ালে অনেকগুলো মাল্টি-স্টোরিড বাড়ির ফটো বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখে হয়েছে। 'নবজীবন হাউসিং

কনসার্ন' এইসব বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে।

সুদীপার টেবিল থেকে কয়েক ফুট দূরে ডান পাশের দেওয়াল ঘেঁষে কাচের বুক-কেসে আর্কিটেকচার, কোম্পানি ল এবং ইনকাম-ট্যাক্স সংক্রান্ত নানা রেফারেন্সের বই সাজানো রয়েছে। আর বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে স্টিলের সুদৃশ্য ছোট একটা চেয়ার এবং টেবিল। ঐ জায়গাটা সুদীপার সেক্রেটারি-কাম-পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট লিজার জন্য নির্দিষ্ট। পুরো নাম এলিজাবেথ স্যাণ্ডার্স। ওরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

ঘরে ঢুকেই সুদীপা দেখতে পেল, এর মধ্যে লিজা এসে গেছে। তারও ডিউটি আওয়ার্স সাড়ে ন'টা থেকে, কিন্তু সুদীপা আগে আসে বলে সে-ও ন'টার ভেতরেই চলে আসে। অবশ্য অফিসে ঢুকবার মুখে যে মধ্যবয়সী বেয়ারাটার সঙ্গে দেখা হল, সে-ও লিজার মতোই রোজ অফিস শুরুর আগে এসে পড়ে। ফাঁকা অফিসে সুদীপার যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে ওদের তীক্ষ্ণ নজর।

সুদীপাকে দেখে লিজা উঠে দাঁড়াল। স্নিগ্ধ গলায় বলল, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম।'

লিজার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। মাথার চুল-লালচে, চোখ কটা। তবে গায়ের রঙ বাদামী বা সাদাটে নয়। বলা যায় বাঙালীসুলভ, অর্থাৎ কিনা শ্যামাভ। চোখ আর চুলের কথা ভুলতে পারলে স্বচ্ছন্দে তাকে বাঙালী মেয়ে বলে চালানো যায়। দুর্দান্ত ফিগার তার, গায়ে এক ফোঁটা বাজে ফ্যাট নেই। লম্বাটে মুখে বুদ্ধি এবং স্মার্টনেসের ছাপ।

লিজার পরনে প্রিন্টেড ভয়েল শাড়ি; শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মতো স্কার্ট বা গাউন পরে না সে। গলায় সরু সোনার হার, নৌকোর আকারে মীনে করা লকেটটা বুকের মাঝখানে ঝুলছে। কপালে কুমকুমের টিপ। পায়ে উঁচু হীলের জুতো।

'গুড মর্নিং'—বলে রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল সুদীপা। বিরাট হ্যাণ্ডব্যাগটা টেবিলে রাখতে রাখতে লক্ষ্য করল বেয়ারা বা লিফ্‌টম্যানের মতো লিজা অবাক হয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। লাজুক একটু হেসে ফের বলল, 'হঠাৎ শাড়ি পরতে ইচছা হল, তাই—'কথাগুলো নিজের কানে খানিকটা কৈফিয়তের মতোই শোনাল যেন।

লিজা উত্তর দিল না, তাকিয়েই রইল।

এবার পরিষ্কার বাঙলায় সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা আজ কেমন আছেন? বাঙলা ভাষাটা ভালো বুঝতে পারে লিজা, বলতেও পারে চমৎকার। সেইজন্যই বাঙলাতে কথা বলে।

এমনিতে সুদীপা দারুণ কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। অফিসে বসে কারো কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সে কৌতূহল দেখায় না। অফিস কাজের জায়গা। কাজ ছাড়া এখানে অন্য বিষয়ে কেউ সময় নষ্ট করুক, সুদীপার তাতে প্রচণ্ড আপত্তি। এমপ্লয়ীদের সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, 'আমরা আপনাদের ইন্টারেস্ট দেখি, আশা করি আপনারাও আমাদের ইন্টারেস্ট দেখবেন। উই ডু সামথিং ফর ইউ অ্যাণ্ড ইউ ডু সামথিং ফর আস।' কিন্তু লিজার ব্যাপার কিছুটা আলাদা। মোটে দু' মাস হল এই কনসার্নে চাকরি নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু এর মধ্যেই কথাবার্তা, আচরণ, কাজ সম্পর্কে সিরিয়াসনেস—সব মিলিয়ে এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। তা ছাড়া তার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও লিজা লক্ষ্য রাখে। সুদীপার আগের সেক্রেটারিটি ছিল কাজের ব্যাপারে ভয়ানক অগোছালো। দরকারী ফাইল, করেসপনডেন্স বা ডকুমেন্ট অনেক সময় হাতের কাছে গুছিয়ে দিত না। এই নিয়ে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু লিজার মধ্যে একটা নি... সেন্স সব সময় কাজ করে। সুদীপার কখন কী দরকার, সে যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারে। অফিসের ব্যাপারে তার ওপর বেশ খানিকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সুদীপা। ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে লিজার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কখন যে আগ্রহী হয়ে পড়েছিল, সে নিজেও বলতে পারবে না।

সুদীপা জানে, ক'দিন ধরে জ্বর চলছে লিজার মায়ের। রোজই অফিসে এসে সে তার মায়ের খবর নেয়।

লিজা বলল, 'আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, জ্বরটা একটু কম।'

সুদীপা বলল, 'রোজই তো সকালের দিকে জ্বর কম থাকে। কিন্তু পুরোপুরি ছাড়ছে কী?' একটু থেমে বলল, 'তোমার মা সাত দিন ধরে ভুগছেন না?' বলতে বলতে লক্ষ্য করল, যান্ত্রিক নিয়মে দ্রুত হাত চালিয়ে প্রচুর কাগজপত্র গোছগাছ করছে লিজা। না দেখেও সুদীপা বলে দিতে পারে ওগুলো কাল বিকেলের ডাকের চিঠি। আগের দিনের শেষ তাকের চিঠিপত্র সেদিন আর সুদীপাকে দেওয়া হয় না। পরের দিন সকালে ওগুলো দেখে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে অন্য কাজ শুরু করে সে।

লিজা বলল, 'না, পাঁচ দিন।'

'ব্লাড কালচার করানো হয়েছে?'

'না, ভেবেছিলাম সেরে যাবে। তাই—'

'এমনি এমনি হাওয়ায় সেরে যাবে! ডাক্তার দেখিয়েছ? না, সেটাও দরকার মনে কর নি?'

সুদীপার আজকের সাজপোশাক লিজাকে অবাক করে দিয়েছিল আগেই। কিন্তু তার বিস্ময়টা অন্য কারণেই বেড়ে যেতে লাগল। অন্য দিন মায়ের জ্বরের খবরটুকু নিয়েই চুপ করে যায় সুদীপা। সেই তুলনায় আজ অনেক বেশি কথা বলছে সে। ব্যাপারটা নতুন। ব্যস্তভাবে লিজা বলে উঠল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ,. দেখিয়েছি।'

সুদীপা বলল, 'নিশ্চয়ই কোয়াক?'

'না, ভাল ফিজিসিয়ান—এম. বি. বি. এস.। আমাদের পার্ক সার্কাস এরিয়ায় যথেষ্ট নাম আছে।'

'ভালো হলে এতদিন জ্বর চলছে, এখনও রক্ত পরীক্ষা করল না! লোকটার ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া উচিত।'

'বলেছেন আজকের দিনটা দেখে কাল সকালে ব্লাড নিয়ে যাবেন।'

সুদীপা লিজারের ফ্যামিলির সব কথাই জানে। বাবা, মা এবং সে ছাড়া আর কেউ নেই। দুই দাদা চাকরি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সেটল করেছে। বাবা একটা বড় প্রাইভেট ফার্মে সিকিউরিটি অফিসার। সেখান থেকে ছুটি পাওয়া মুশকিল। লিজা আর তার বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে অসুস্থ মাকে দেখার আর কেউ থাকে না। সুদীপা বলল, 'কাল থেকে তুমি এক উইক ছুটি নাও।'

লিজা বলল, 'ছুটি নিলে আপনার কাজের অসুবিধা হবে।' বলতে বলতে একটা কভার ফাইলের ভেতর কালকের শেষ ডাকের চিঠিগুলো সাজিয়ে সুদীপার সামনে রাখল। তারপর একটা ডট পেন আর নোট বই এনে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিটি চিঠি পড়ে সুদীপা তাকে ইনস্ট্রাকশান দেয়। সেই অনুযায়ী উত্তর তৈরি করে সুদীপাকে দিয়ে সই করিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

সুদীপা একটু হাসল। বলল, 'দু'মাস তুমি এখানে এসেছ। তার আগেও আমার কাজ চলেছে। যে সাত দিন ছুটি নেবে, তখনও চলে যাবে। আমার কাজের চাইতে তোমার মাকে সারিয়ে তোলা অনেক বেশি জরুরী।'

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল লিজার। বলল, 'আজ রাত্তিরে আমার এক মাসীমার আসার কথা আছে। এলে ক'দিন থাকবেন, মাকে দেখাশোনা করতে পারবেন। না এলে ছুটি নেব।'

সুদীপা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। টেবিলের ড্রয়ার থেকে পুরু সেলের চৌকো চশমাটা বার করে পরে নিল। এটা অফিসেই থাকে। বাড়িতেও অবিকল এরকম আরেকটা আছে। আজকাল লেখাপড়ার জন্য চশমা দরকার হয়। অন্য সময় না পরলেও চলে। এই চশমাটা তার চেহারায় বাড়তি অনেকটা ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য এনে দেয়।

No. 8038
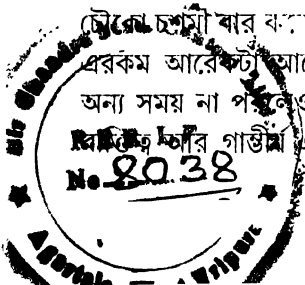
কভার ফাইলটা খুলে চিঠি দেখতে লাগল সুদীপা। প্রতিটি চিঠির সঙ্গে তার বিষয় ছোট কাগজের টুকরোয় তিন-চার লাইনে লিখে পিন দিয়ে গেঁথে রেখেছে লিজা। তাতে গোটাটা পড়ার পরিশ্রম বাঁচে। লিজার কাজ একেবারে নিখুঁত এবং মেথডিক্যাল।

প্রথম চিঠিটা বাহেরিনের এক বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের। তিনি কলকাতায় আড়াই- তিন লাখের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট কিনতে চান। সবটাই ডলারে পেমেন্ট করবেন। পরের তিনটে চিঠিও মিডল-ইস্ট থেকেই এসেছে। একটা কুয়েত থেকে, একটা ইরাক থেকে, একটা আবুধাবি থেকে। সবারই আর্জি কলকাতায় ফ্ল্যাট বা বাংলো চাই।

চিঠিগুলো দেখতে দেখতে সুদীপা বলল, 'পেট্রোডলারের দেশগুলো থেকে রোজই দেখছি ফ্ল্যাটের জন্যে চিঠি আসছে!'

লিজা বলল, 'হ্যাঁ, অ্যাভারেজে ডেইলি তিন-চারটে করে।'

'লাস্ট উইকে আমেরিকা আর কানাডা থেকেও তো ক'জন ফ্ল্যাটের জন্যে লিখেছিল।'

'হ্যাঁ। তার আগের উইকে চিঠি এসেছিল ইংল্যাণ্ড আর ওয়েস্ট জার্মানী থেকে।'

'প্রচুর বাঙালী ওয়ার্ল্ডের নানা জায়গায় কাজ নিয়ে গেছে, তাই না লিজা!'

'হ্যাঁ ম্যাডাম।'

সুদীপা বলল, 'সবাই ডলার, মার্ক, পাউণ্ডে দাম দেবে। দেশের পক্ষে এ একরকম ভালোই।'

সুদীপা কী বলতে চায়, লিজা বুঝতে পেরেছে। সে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ ম্যাডাম। ডলার-টলার পেলে ইণ্ডিয়ারই অনেক লাভ।'

'সারা জীবন তো আর বাইরে পড়ে থাকতে পারে না। রিটায়ারমেন্টের পর লাস্ট লাইফটা দেশে কাটাবার জন্যে সবাই আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখতে চায়।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না লিজা।' বলেই ফাইল থেকে চোখ তুলল সুদীপা।

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল লিজা।

সুদীপা বলল, 'আমরা তো গালফ্ কান্ট্রি বা ইউরোপ-আমেরিকার কোনো কাগজে বিজ্ঞাপন দিই না। তা হলে ওখানকার বাঙালীরা আমাদের কোম্পানির নাম জানল কী করে?'

একটু ভেবে লিজা বলল, 'হয়ত এখান থেকেই কেউ কেউ ফরেনে তাদের

আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের কথা জানিয়েছে। তারপর মুখে মুখে নবজীবন হাউসিংয়ের নাম ছড়িয়ে গেছে।'

'দ্যাটস রাইট।' সুদীপা বলতে লাগল, 'আমাদের কনসার্নের গুড-উইল তা হলে হোল ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে গেছে!' বলে হাসল, পরিতৃপ্ত উজ্জ্বল হাসি।

'নিশ্চয়ই।'

'এ তো আমাদের পক্ষে বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। কিন্তু লিজা একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী?'

'দেশের ভেতর থেকে বা ফরেন থেকে যাঁরা চিঠি লিখছেন, তাঁদের ফাইভ পারসেন্টকেও ফ্ল্যাট বা বাংলো দিতে পারব না। কোত্থেকে দেব বল? কলকাতা বা আশেপাশে এক ইঞ্চি ল্যাণ্ড পেতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। বিল্ডিং মেটিরিয়ালের যা স্কেয়ার্সিটি—' মেকানিক্যাল অভ্যাসে সুদীপা কথা বলে বা কাজ করে যাচ্ছে ঠিকই, তবে যত সময় যাচ্ছে ততই বুকের ভেতর সেই এস্রাজের বাজনাটা আরো তীব্র আরো জোরালো হয়ে উঠছে।

একটু চুপ।

তারপর সুদীপাই আবার শুরু করল, 'এঁদের দিয়ে দাও, আপাততঃ আমাদের হাতে ফ্ল্যাট নেই। আপনাদের নাম-ঠিকানা রেখে ছিলাম। কিন্তু ব্যবস্থা করতে পারলে জানিয়ে দেব। অনুগ্রহ করে আমাদের স্মরণ করেছেন, সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।' একটু থেমে বলল, 'টাইপ করে একটা ক্লায়েন্টের নামে পাঠিয়ে দেবে, ডুপ্লিকেটটা রেকর্ড সেকশনের মিস্টার ব্যানার্জীকে দেবে। ব্যানার্জী ঠিকমতো যেন ফাইল করে রাখেন। পরে দরকার হতে পারে।'

লিজা শর্টহ্যাণ্ডে সুদীপার কথাগুলো নোট করে নিল।

প্রথম পাঁচটা চিঠি লেখা হয়ে গিয়েছিল। এগুলোর পর রয়েছে একটা লম্বা সাদা খাম। সেটা খোলা হয় নি। সুদীপার ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে সেটা তুলে নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, এই এনভেলপটা দেখ নি?'

লিজা বলল, 'দেখেছি।'

সুদীপা একটু অবাক হয়েই বলল, 'তাহলে খোল নি কেন? তোমাকে তো সব চিঠিই খুলতে বলেছি।'

দ্বিধান্বিতভাবে লিজা বলল, 'ওটা আপনার পার্সোনাল চিঠি। তাই খুলি নি।'

এবার ভালো করে খামটা লক্ষ্য করল সুদীপা। তার নাম ঠিকানা ইংরেজীতে টাইপ করা হয়েছে। এক কোণে লেখা 'স্ট্রিক্টলি পার্সোনাল অ্যাণ্ড

কনফিডেন্সিয়াল'।

এপিঠে ওপিঠে কোথাও স্ট্যাম্প নেই। তার মানে চিঠিটা ডাকে আসে নি, কেউ হাতে করে দিয়ে গেছে।

সুদীপা আস্তে আস্তে খামটা খুলে ভেতর থেকে চিঠি বার করল। ধবধবে সাদা দামী কাগজে ইংরেজীতে টাইপ করা আট-দশ লাইনের ছোট্ট চিঠি। নিচে কারো নাম নেই।

চিঠিটার ওপর সামান্য ঝুঁকল সুদীপা। পড়তে পড়তে হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে যেতে লাগল যেন। টের পেল, শীততাপনিয়ন্ত্রিত এই আরামদায়ক ঘরেও গলগল করে ঘামতে শুরু করেছে। মুহূর্তে জামা-টামা ভিজে গেল তার। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোঁক গিলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

বেনামী চিঠিটা বাঙলায় তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় তা এইরকম। 'তেরো বছর আগে আপনার যে পুত্রটি হয়েছিল, সে কোথায় আছে জানতে চাই।' একটা নামকরা ইংলিশ ডেইলির নাম করে পত্রদাতা লিখেছে, আগামী রবিবার ওখানকার পার্সোনাল কলমে এই খবরটা দিলে সে কৃতজ্ঞ থাকবে। খবরের তলায় সুদীপার নামের আদ্যক্ষর 'S' দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাহলে পত্রদাতার পক্ষে বুঝতে সুবিধা হবে। অবশেষে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি শেষ।

কে এই চিঠি দিতে পারে? বাবা আর ঠাকুমা ছাড়া আর যে তেরো বছরের একটা ছেলে আছে, এ খবর কারো পক্ষে জানা সম্ভব না। সমস্ত পৃথিবীর কাছে সে একজন অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে। তার ছেলের খবর সে জানতে পারত, তার সঙ্গে কবেই তো সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। তিনশো কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে সে কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে জানে? তবে কি তার জীবনের অত্যন্ত গোপন আর লজ্জাকর একটা দিকের কথা আচমকা কেউ জেনে ফেলে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে?

কার্পেট মোড়া এই চেম্বার, চেয়ার-টেবিল, দেওয়াল মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ের ফোটো—সমস্ত দৃশ্যপট চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে মুছে গেল যেন। সিনেমার মনতাজ দৃশ্যের মতো এলোমেলো টুকরো টুকরো কিছু ছবি অদৃশ্য কোনো পর্দায় ফুটে উঠতে লাগল। পুলিস ভ্যান, কোর্টরুম, কালো কোট পরে বহুদিন বাদে মামলা করতে নামা উমাপ্রসাদ, আর একটি বিষণ্ন করুণ যুবকের মুখ—যার নাম রণবীর, রণবীর মুখার্জী। কত কাল বাদে রণবীরের নাম মনে পড়ল তার!

দু'হাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো বসে রইল সুদীপা। কতক্ষণ বাদে খেয়াল নেই, লিজার গলা কানে ভেসে এল, 'ম্যাডাম—'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে সুদীপা তাকাল। লিজা গভীর উদ্বেগ নিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

মনের মধ্যে যে ভাঙচুর আর তোলপাড় চলছে, সেটা কারো, বিশেষ করে নিজেরই একজন অধীনস্থ কর্মচারীর কাছে ধরা পড়ুক, তা চায় না সুদীপা। রুমাল দিয়ে কপাল এবং গলার ঘাম মুছে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল সে। অল্প হেসে বলল, 'না, তেমন কিছু না। হঠাৎ মাথাটা রীল করে উঠল। মনে হয় ব্লাড প্রেসারে কোনরকম গোলমাল হয়েছে।'

'ডাক্তারকে ফোন করব?'

'দরকার নেই। আই অ্যাম অলরাইট। বাড়ি ফিরে আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে 'কল' দেব।' বলতে বলতে বেনামী চিঠিটা খামে পুরে নিজের হ্যাণ্ডব্যাগে রেখে দিল।

এরপর আর কিছু বলার নেই। লিজা কোনো ব্যাপারেই অনাবশ্যক কৌতূহল দেখায় না। এই চিঠির ব্যাপারেও দেখাল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'এই চিঠিটা কে দিয়ে গেছে, বলতে পারবে?'

লিজা বলল, 'না ম্যাডাম। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে আমাদের লেটার বক্সে কেউ দিয়ে যেতে পারে।'

'তাই হবে।'

সুদীপা আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাইরে জোর করে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করলেও ভেতরে ভেতরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো প্রচণ্ড অস্থিরতা চলছে।

আরো কিছুক্ষণ কাটল। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একসময় লিজা বলল, 'ম্যাডাম, অন্য চিঠিগুলো কি দেখবেন?'

সুদীপা আস্তে মাথা নাড়ল, 'না, আজ আর ভালো লাগছে না। ফাইলটা তোমার কাছে রেখে দাও। কাল দেখব।'

ফাইল নিয়ে লিজা নিজের জায়গায় চলে গেল। পাঁচখানা চিঠি সম্পর্কে সুদীপা যে নোট দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী করেসপনডেন্স তৈরি করতে লাগল। কিন্তু ঘুরে ঘুরে তার চোখ সুদীপার দিকেই চলে যাচ্ছে। দু'মাসের মধ্যে তাকে এমন বিচলিত আর অস্থির হতে কখনও দেখে নি লিজা।

এদিকে সুদীপা আবার দূরমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। তার মাথার ভেতরে

আগুনের চাকার মতো অনবরত কিছু একটা পাক খেয়ে চলেছে। আজকের দিনটা তার কাছে সব দিক থেকেই আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠতে পারত। দুপুরে লাঞ্চব্রেকের সময় মৃন্ময়ের আসার কথা। পার্ক স্ট্রীটের একটা দামী রেস্তোরাঁয় আগে থেকে টেবিলও 'বুক' করা রয়েছে। ঠিক আছে, একসঙ্গে তারা লাঞ্চ খাবে। আর সেই সময় নিজের সিদ্ধান্তের কথা মৃন্ময়কে জানিয়ে দেবে। আজ যা বলবে বলে একটু একটু করে মনকে তৈরি করেছে তা শোনার জন্য পাঁচটা বছর অপেক্ষা করে আছে মৃন্ময়। আর আজই এল এই মারাত্মক চিঠিটা! সেই সঙ্গে অন্ধকার খাপ খুলে বিষাক্ত ভয়াবহ অতীত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যেন।

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠল সুদীপা। তার নয়, লিজার টেবিলে ইন্টারন্যাল কানেকশানের লাইনটা বাজছে। লিজা দ্রুত সেটা তুলে নিয়ে কী শুনে 'প্লীজ হোল্ড অন' বলেই সুদীপার দিকে তাকাল। রিসিভারটা কান থেকে হাতে নিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, দশটায় জরুরী একটা মিটিং হবার কথা ছিল। এখন দশটা কুড়ি। মিস্টার সান্যাল, মিস্টার রাহা, মিস্টার তরফদার আর মিস্টার তলাপাত্র আপনার জন্যে কনফারেন্স রুমে ওয়েট করছেন।'

সুদীপার মনে পড়ে গেল। মাল্টি-ন্যাশনাল একটা কোম্পানি কলকাতায় তাদের হেড কোয়ার্টারের জন্য হাই-রাইজ বিল্ডিং করতে চায়। এক লাখ পঞ্চাশ হাজার স্কোয়ার ফুটের এই সুবিশাল বাড়িটার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ওরা টেণ্ডার চেয়েছে। দেড় মাস ধরে এ ব্যাপারে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা করে খেটে সুদীপা আর কোম্পানির দু'জন সিনিয়র আর্কিটেক্ট বাড়িটার একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে, সেই সঙ্গে একটা মডেলও। কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের পারচেজ অফিসার আর সিভিল ইঞ্জিনীয়াররা মেটিরিয়াল থেকে লেবার পর্যন্ত যাবতীয় খরচের হিসাব করেছেন। আজ বাড়ির নকশা আর তৈরির খরচ সম্পর্কে ডিটেল আলোচনার জন্য মিটিংটা আগে থেকেই ডেকেছিল সুদীপা। এ দুটো ব্যাপার ফাইনাল করে সব খরচের ওপর দশ থেকে পনের পার্সেন্ট প্রফিট করে টেণ্ডার দেওয়া হবে।

আজকের মিটিংয়ে যে চারজনকে ডাকা হয়েছে, তাঁরা কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। নিরঞ্জন রাহা সিনিয়ার আর্কিটেক্ট, পরিতোষ তরফদার পারচেজ অফিসার, পুণ্যব্রত সান্যাল আর সব্যসাচী তলাপাত্র সিভিল ইঞ্জিনীয়ার।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'লাইনে কে কথা বলছেন?'

লিজা বলল, 'রাহাসাহেব।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে বল।'

লিজা তাই বলে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুদীপার টেবিলে একটা ফোন বেজে উঠল। সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই নিরঞ্জন রাহার গলা ভেসে এল, 'আপনি আমাকে ফোন করতে বলেছেন?'

সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ। আচ্ছা মাল্টি-ন্যাশানাল কোম্পানির ঐ বাড়িটার টেণ্ডার দেবার লাস্ট ডেট কবে?'

'টোয়েন্টিসিক্সথ সেপ্টেম্বর।'

টেবিল ক্যালেণ্ডারটা দ্রুত দেখে নিয়ে সুদীপা বলল, 'আজ ফোরটিনথ। তার মানে মাঝখানে এগার দিন রয়েছে। আজ মিটিংটা বন্ধ থাক। কাল বসব। কাইণ্ডলি অন্য সবাইকে বলে দিন, অনুগ্রহ করে কাল দশটায় ওঁরা যেন কনফারেন্স রুমে চলে যান। কিছু মনে করবেন না প্লীজ।'

'না না, মনে করব কেন! সবাইকে বলে দিচ্ছি। হঠাৎ কী হল, শরীর খারাপ নাকি?'

গলা শুনে মনে হল, নিরঞ্জন রাহা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তার কারণও আছে। যে আট বছর ধরে এই অফিসে সুদীপা আসছে তাতে মিটিং ডেকে বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বাতিল করেছে, এমন কোনো ঘটনাই নেই।

সুদীপা বলল, 'তেমন কিছু নয়। ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'একটা কথা বলব?'

'অবশ্যই।'

'আজ বরং বাড়ি চলে যান।'

'বাড়ি যাবার মতো কিছু হয় নি।' বলে নিরঞ্জন রাহাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল সুদীপা।

কিন্তু পাঁচ মিনিটও কাটল না, গোটা অফিসেই সম্ভবত সুদীপার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ল। একে একে নিরঞ্জন রাহা, পরিতোষ তরফদার, পুণ্যব্রত সান্যাল থেকে শুরু করে ছোট বড় অনেক অফিসার তার চেম্বারে এসে প্রচুর পরিমাণে উদ্বেগ জানিয়ে গেলেন। সবাই শুভাকাঙ্ক্ষী কিন্তু এই মুহূর্তে কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। কোনরকমে তাঁদের বিদায় করল সুদীপা। তারপর লিজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ আমার আর কী কী প্রোগ্রাম আছে?'

লিজা জানিয়ে দিল, লাঞ্চের পর আর্কিটেক্টদের নিয়ে বসতে হবে। একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি চারটে বারোতলা বাড়ি তৈরি করবে। টেণ্ডার দিয়ে সেই কাজটা পাওয়া গেছে। মোটামুটি বাড়িগুলোর প্ল্যানও করা হয়েছে। কর্পোরেশনে সেগুলো জমা পড়ারও কথা ছিল কিন্তু কো-অপারেটিভের লোকেরা এখন চাইছে প্ল্যানের কিছু হেরফের করা হোক। সেই কারণে

আর্কিটেক্টদের নিয়ে বসা দরকার।

সুদীপা বলল, 'আকিটেক্টদের জানিয়ে দাও, আজ আমি ওঁদের সঙ্গে বসতে পারছি না।

লিজা বলল, 'আচ্ছা।' একটু ভেবে ফের শুরু করল, 'বিকেলে একটা পার্টি আসবে। ওরা সাউথ ক্যালকাটায় একটা আইস স্কেটিং রিংক করতে চান।'

'মিস্টার রাহাকে বলো, তিনি যেন আজ প্রাইমারি কথাবার্তা বলেন, পরে আমি কথা বলব।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কাজ তোমাকে করতে হবে।'

'বলুন।'

'ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে পার্সোনালি গিয়ে জানিয়ে দেবে, আজ আমার পক্ষে কারো সঙ্গে দেখা করা সম্ভব না। এমনভাবে বলবে যেন কেউ ভুল না বোঝে। আর টেলিফোন অপারেটারকে জানিয়ে দাও, খুব জরুরী না হলে আমার ঘরে যেন লাইন না দেয়।'

লিজা প্রথমে ফোন তুলে অপারেটারকে সুদীপার কথা জানিয়ে দিল। তারপর চেম্বার থেকে বেরিয়ে নানা ডিপার্টমেন্টে খবর দিতে গেল।

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে চোখ বুজে বসে ছিল সুদীপা। কতক্ষণ পর মনে নেই, খুব কাছ থেকে লিজার নরম গলা কানে এল, 'ম্যাডাম—'

চমকে চোখ মেলে তাকাল সুদীপা। দেখল, ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিজা। আগে বেয়ারা চা দিয়ে যেত। লিজা আসার পর চা তৈরির দায়িত্বটা সেই নিয়েছে।

এই চেয়ারের ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে আটাচড বাথ। সেটার গায়ে রয়েছে একটা ছোট ক্লোজেট। লিজা সেখানে গ্যাসট্যাস আনিয়ে ছোটখাটো কিচেন বানিয়ে নিয়েছে।

অফিসে দু'বার চা খায় সুদীপা। দুপুর বারোটায় আর বিকেল চারটেয়। এক মিনিটও এদিক-ওদিক হয় না, দু'বারই ঠিক সময়ে চা নিয়ে আসে লিজা।

ঘড়ি না দেখেও সুদীপা বলে দিতে পারে, এখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। সে বলল, 'বলো।'

লিজা টেবিলের ওধারে বসে টী-পট সুগার-পট মিল্ক-পট ইত্যাদি থেকে দুটো কাপে লিকার চিনি দুধ ইত্যাদি ঢেলে চা বানিয়ে নিল। তারপর একটা কাপ দিল সুদীপাকে আরেকটা নিজে নিল। প্রথম প্রথম নিজের জন্য চা

করত না লিজা। তাতে সুদীপা রাগারাগি করত। ফলে এখন দু'জনের জন্যই করতে হয় এবং মুখোমুখি বসে খেতেও হয়।

চায়ে একটু চুমুক দিয়ে সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'ডিপার্টমেন্টগুলোতে খবর দিয়ে এসেছ?

লিজা বলল, 'হ্যাঁ।'

এরপর আর কিছু জানতে চাইল না সুদীপা।

অদ্ভুত এক নৈঃশব্দের মধ্যে চা খাওয়া শেষ হল। ট্রে এবং কাপপ্লেটগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল লিজা। আর সুদীপা আবার পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে বসে রইল।

আরো এক ঘণ্টা পর ঠিক একটায় মৃন্ময় এল। সুদীপার মতোই ডিসিপ্লিনেরিয়ান সে। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ম এবং ছকে বাঁধা। তার স্বভাবের মধ্যে রয়েছে প্রখর শৃঙ্খলাবোধ।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। টানটান চেহারা। গায়ের রঙ কালোই। চওড়া কপাল, ব্যাকব্রাশ করা ঘন চুল, জোড়া ভুরু, দৃঢ় থুতনি। ছ'ফুটের মতো হাইট। যেটুকু মেদ থাকলে এই বয়সে মানিয়ে যায় ঠিক সেইটুকুই রয়েছে। তার মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সবল পুরুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

আগে কোনদিনই ট্রাউজার্স-শার্ট ছাড়া দ্যাখে নি সুদীপা। আজ সে ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরে এসেছে। পায়ে চকচকে পাম্প-শু। তার জীবনে আজকের দিনটা খুবই স্মরণীয়। ভেতরকার খুশি উছলে উঠে এসে তার সাজপোশাকে ছড়িয়ে পড়েছে যেন।

বেনামী চিঠিটা না এলে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসার জন্য মৃন্ময়কে ঠাট্টা-টাট্টা করত সুদীপা। বলত, 'একেবারে জামাই সেজে এসেছ দেখছি।' কিন্তু তাকে দেখামাত্র বিচিত্র এক ভয় আর পাপবোধ সুদীপার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার মনে হল, এতক্ষণ অফিসে বসে না থেকে বাড়ি চলে গেলেই ভালো হত।

সামনের একটা চেয়ারে বসতে গিয়ে মৃন্ময়ের নজর সুদীপার শাড়ি-টাড়ির দিকে এসে পড়ল। চোখের তারা গোল করে রগড়ের গলায় চেঁচিয়েই উঠল সে, 'আরে বাবা, এ কী! শাড়ি-ফাড়ি পরে একেবারে বিয়ের কনে সেজে এসেছ! ফাইন! ভেবেছিলাম, ধুতি পরে এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব। তুমিই দেখছি হোল বডিতে সারপ্রাইজ নিয়ে বসে আছ।'

এভাবে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে মৃন্ময়কে দ্যাখে নি সুদীপা। এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। এমনিতে মৃন্ময় খুবই ধীর স্থির এবং গম্ভীর প্রকৃতির

মানুষ। সে শোনে বেশি, বলে কম। যা বলে, খুব ওজন করে, মেপে। হাসি উচ্ছ্বাস আনন্দ—সবই তার পরিমিত। কিন্তু আজকের এই দিনটা একেবারেই আলাদা যে।

সুদীপা কিছু বলল না। ব্লটিং পেপারের মতো অদৃশ্য কিছু যেন তার সব উৎসাহ, উচ্ছ্বাস এবং জীবনীশক্তি চুষে নিয়েছে।

মৃন্ময় আবার বলল, 'তোমাকে আজ যা দেখাচ্ছে না—এক্সকুইজিটলি বিউটিফুল। একেবারে ড্রিম-গার্ল। বলতে বলতে হঠাৎ লিজার দিকে নজর পড়ল। একটু লজ্জা পেল সে। দ্রুত নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সুদীপার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আই অ্যাম স্যরি। ভুলে গিয়েছিলাম, দিস ইজ অফিস।'

সুদীপা এবারও চুপ করে রইল।

মৃন্ময় বলতে লাগল, 'আর বসে থেকে কী হবে? লাঞ্চব্রেক তো হয়ে গেছে। চল বেরিয়ে পড়া যাক। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

সুদীপা একবার ভাবল, মৃন্ময়ের সঙ্গে যাবে না। কিন্তু পরক্ষণেই ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চল—'। তার মধ্যে নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই যেন কাজ করছে না।

সুদীপারা বেরিয়ে যাবার মিনিট দশেক বাদে টেলিফোন তুলে অপারেটরকে একটা লাইন দিতে বলল লিজা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নাম্বারটা পাওয়া গেল। খুব নিচু গলায় সে বলল, 'কে, মিস্টার মুখার্জী?'

ওধার থেকে পুরুষের গলা ভেসে এল, 'লিজা নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তোমার ফোনের জন্যই ওয়েট করছি; লাঞ্চে বেরুতে পারছি না। তারপর খবর কী?'

'ফাইন। আপনি যেমন যেমন ছক করে দিয়েছেন সেইভাবে কাজ করে গেছি।'

'খামটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তোমার মালকিন ওটা খুলে পড়েছেন?'

'নিশ্চয়ই। পড়াবার জন্যে এত বড় একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে দিয়েছেন। পড়বেন না মানে?'

'কি অ্যাকশান?'

'একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।'

'সিমপ্যাথি?'

'শী ইজ এ গ্রেট লেডী। প্রথম থেকেই আমাকে স্নেহ করে আসছেন। একটু সিমপ্যাথি হওয়া তো উচিতই।'

লাইনের ওধার থেকে সামান্য হাসির আওয়াজ ভেসে এল, 'গুড। নতুন মালকিনের ব্যাপারে তোমার লয়ালটির কথা জেনে খুশি হলাম।'

লিজা বলল, 'আপনার সম্পর্কে আমার লয়্যালটি একটুও কম নয় কিন্তু; বরং কয়েক গুণ বেশিই।'

'দ্যাট আই নো, দ্যাট আই নো। তা নাহলে ঝুঁকি নিয়ে তুমি ওখানে চাকরি করতে যাবে কেন? আমি জানি, আমার জন্যেই গেছ। সে যাক, আর সব খবর ডিটেলে দাও।'

'আজ আমার 'বস' খুব সেজে এসেছিলেন। দামী শাড়ি, ভালো অর্নামেন্ট—এইসব পরেছিলেন। আগে আর কখনও তাঁকে এরকম সাজতে দেখি নি।'

'আর তাঁর প্রেমিকটি?'

'তিনিও খুব সেজেছেন আজ। ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি পরেছেন। গা থেকে ফরেন সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছিল।'

'একেবারে জামাইবাবুটি সেজে এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'মৃন্ময় চ্যাটার্জী মিস মিত্রকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।'

'ঐরকম একটা চিঠি পাবার পরও তোমার 'বস' তাঁর লাভারের সঙ্গে যেতে পারলেন? ভদ্রমহিলার নার্ভের জোর আছে বলতে হবে।'

'উনি নিজের থেকে গেলেন বলে মনে হল না। মৃন্ময় চ্যাটার্জিই তাঁকে নিয়ে গেলেন, বলা যায়। চিঠিটা পাবার পর মিস মিত্র কেমন যেন হয়ে গেছেন।'

'ওঁরা কোথায় গেলেন, বলতে পারবে?'

'কথাবার্তা শুনে মনে হল, কোন রেস্তোরাঁয় যাবেন। টেবিল 'বুক' করা আছে। দুপুরে একসঙ্গে লাঞ্চ করবেন।'

'আই সী।'

একটু চুপচাপ। তারপর লাইনের ওধার থেকে সেই গলাটা আবার ভেসে এল—

'তুমি কি কারো এজেন্ট আর বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে নবজীবন হাউসিংয়ে ঢুকেছ, তা কি তোমার 'বস' সন্দেহ করতে পেরেছেন?'

লিজা বলল, 'এখনও পারেন নি।'

'বী কেয়ারফুল। মিস মিত্র ইজ এ ভেরি ভেরি ইনটেলিজেন্ট লেডী।'

'জানি। আমারও একটু-আধটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। আমাকে ধরে ফেলা খুব সহজ না। আমার ওপর ডিপেণ্ড করতে পারেন।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তোমার ওপর ভরসা করতে না পারলে কি এরকম একটা বিপজ্জনক কাজে পাঠাতে পারি? তোমার বুদ্ধি, ধীর-স্থির নেচার, তোমার কাজের মেথড—সব কিছুর ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা।'

'ফ্ল্যাটারি?'

'একেবারেই না। যা বললাম খাঁটি সত্যি।'

'ধন্যবাদ।'

'এখন একটা কাজের কথা শোন।'

'বলুন।'

'ওঁরা দু'জনে তোমাদের অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলেন, কী করলেন— সব খবর নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার জানিয়ে দেবে।'

'চেষ্টা করব।'

'ও, আরেকটা কথা, তোমার মায়ের জ্বরটা আজ কেমন?'

'পুরোপুরি ছাড়ে নি।'

'ভালো ডাক্তার দেখাও।'

লিজা শব্দ করে হাসল।

'হাসলে যে!' লাইনের ওধারের সেই স্বরটায় কিছুটা বিস্ময় মিশল।

'মিস মিত্রও আমার মায়ের অসুখ নিয়ে খুবই চিন্তিত। মায়ের জন্যে তিনি তো আমাকে ছুটিই নিতে বললেন। আমার দুই মালিকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।'

'দুই মালিক মানে?'

'আপনি আর মিস মিত্র।'

'ও। কিন্তু এখন কিছুতেই তোমার ছুটি নেওয়া চলবে না। রোজ অফিস যাবে। অফিসের পরও যদি সম্ভব হয়, মিস মিত্রের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করবে। আমার অনেক খবর দরকার। বিশেষ করে মিস মিত্রের সেই ছেলেটির খবর।'

'ঠিক আছে। আমার দিক থেকে এ ব্যাপারে ত্রুটি হবে না।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার মায়ের সব দায়িত্ব আমার। সন্ধ্যেবেলা তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। তখন যদি দেখি মায়ের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা নার্সের দরকার, ব্যবস্থা করে দেব।'

গভীর গলায় লিজা বলল, 'ধন্যবাদ স্যার।'

ওধার থেকে লাইন কেটে গেল।

।। চার ।।

কিছুক্ষণ বাদে লিফ্‌টে করে মৃন্ময়ের সঙ্গে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ কী মনে পড়তে সুদীপা বলল, 'নিচে গিয়ে আবার একবার ওপরে উঠতে হবে।'

মৃন্ময় জানতে চাইল, 'কেন?'

'গাড়ির অ্যারেঞ্জমেন্ট করি নি!'

অফিস থেকে বেরুবার আগে বেয়ারা পাঠিয়ে সুদীপা শোফারকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে শোফার আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাকিং এরিয়া থেকে গাড়ি বার করে সে নামা পর্যন্ত ড্রাইভওয়ের পাশে অপেক্ষা করতে থাকে। আজ খবর দিতে ভুলে গিয়েছিল।

মৃন্ময় বলল, 'অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। লাঞ্চের পর যদি অফিসে আসতে চাও, নামিয়ে দিয়ে যাব।'

সুদীপা উত্তর দিল না।

একটু পরে দু'জনে নিচে নেমে এল।

হাই-রাইজ বিল্ডিংটার কমপাউণ্ডের বাইরে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে মৃন্ময়ের ইমপোর্টেড লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুদীপাকে নিয়ে মৃন্ময় সোজা গাড়িটার ব্যাক-সীটে উঠে শোফারকে বলল, 'পার্ক স্ট্রীট।'

বিদেশী গাড়ির চাকা ক্যামাক স্ট্রীটের ওপর দিয়ে তেলের মতো গড়িয়ে যেতে লাগল।

মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব রেখে বসে ছিল সুদীপা। মৃন্ময় কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'মনে হচ্ছে আজকের দিনটা আমার জীবনে সব চাইতে রিমার্কেবল দিন হতে চলেছে। এ ডে অফ অল ডেজ—তাই না?'

এমনিতে মৃন্ময় খুবই ভদ্র, মার্জিত। পাঁচ বছরের ওপর তার সঙ্গে আলাপ, কিন্তু কখনও সে এমন কিছু বলে নি বা এমন আচরণ করে নি যা অশোভন বা দৃষ্টিকটু। একদিনের জন্যও এমন কোনো দুর্বলতা দেখায় নি যা কুরুচিকর। আজ এই মুহূর্তে সে যে গা ঘেঁষে এসে বসল, তার কারণ একটাই। কাল বিকেলে সুদীপা যখন ফোনে জানিয়েছিল. আজ দুপুরে একটা সুখবর দেবে, মৃন্ময় তখনই তা আন্দাজ করে নিয়েছিল। আর তখন থেকেই সুদীপার ওপর এক ধরনের সূক্ষ্ম অধিকারবোধ অনুভব করতে শুরু করেছে।

সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় দেখা হবে?' সুদীপা বলেছিল, 'তুমি যেখানে বলবে।' একটু ভেবে মৃন্ময় বলেছিল, 'কাল দুপুরে আমরা দু'জনে লাঞ্চ খাব। তখনই তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। রেস্তোরাঁয় টেবিল 'বুক' করে রাত্তিরে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

যাই হোক, সুদীপা উত্তর দিল না।

মৃন্ময় আবার বলল, 'জানো, কাল তোমার ফোন পাবার পর থেকে এত থিলড আর এক্সাইটেড হয়ে আছি যে কিছুই করতে পারছি না। কাল হোল নাইট ঘুমোতে পারি নি। ভেবেছি কখন সকাল হবে, সকালের পর দুপুর, তারপর লাঞ্চ টাইমে তোমার মুখোমুখি বসে কখন সেই গুড নিউজটা'—বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্য করল, তার কথা কিছুই শুনছে না সুদীপা; দূরমনস্কর মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে।

মৃন্ময় স্থির চোখে খানিকক্ষণ সুদীপাকে দেখল। তারপর বলল, 'কী ব্যাপার রঞ্জু, কী হয়েছে তোমার?'

সুদীপা চমকে মুখ ফেরাল। হাসার চেষ্টা করল, 'কই কিছু না তো?'

মৃন্ময় সুদীপার দিক থেকে চোখ সরাল না। তাকে দেখতে দেখতে মনে পড়ল, এতক্ষণ উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে সে একাই কথা বলে গেছে। লিফ্‌টে করে নামবার সময় সুদীপা তার গাড়ির ব্যাপারে দু'একটা কথা বলা ছাড়া সারাক্ষণ চুপ করেই আছে। মৃন্ময় বলল, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।'

'কী করে বুঝলে?' সুদীপা সহজ হতে চাইল।

মৃন্ময় বলল, 'ইউ লুক সো ডিপ্রেসড্। নিশ্চয়ই শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে।'

'না-না, আমি ঠিক আছি।'

মৃন্ময় আর কিছু বলল না। কয়েক মিনিটের ভেতর তার লিমুজিন পার্ক স্ট্রীটের এক শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামল।

সুদীপাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকে পড়ল মৃন্ময়। ক্যাশ কাউন্টার-কাম-রিসেপশানে এসে জিজ্ঞেস করতেই জানানো হল, দোতলায় তাদের টেবিল সংরক্ষিত রয়েছে।

বৃটিশ আমলের প্রকাণ্ড একটা বাড়িতে এই রেস্তোরাঁ। ফ্লোরগুলো তিরিশ ফুটের মতো উঁচু। নিচে তো বটেই, ফ্লোরের মাঝামাঝি জায়গায় ব্যালকনির মতো বার করে সেখানেও টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে।

এয়ার-কণ্ডিশানড্ এই রেস্তোরাঁয় আলোর ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে চারদিক স্বপ্নময় আর ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এই লাঞ্চ টাইমে একটা টেবিলও ফাঁকা নেই। একধারে উঁচু ডায়ালে একটা দুর্ধর্ষ চেহারার

ভলাপচুয়াস যুবতী হাতে মাইক নিয়ে পপ সঙ গেয়ে চলেছে; ঘাড় পর্যন্ত চুলগুলো, বেলবটম আর জীনস পরা একদল যুবক ব্যাঞ্জো থেকে বঙ্গো ম্যাণ্ডারিন বাজিয়ে চলেছে। বেয়ারারা খাবার এবং ড্রিংক্‌সের ট্রে নিয়ে ব্যস্ত পায়ে অনবরত এধারে ওধারে ছুটছে।

নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে মৃন্ময় আর সুদীপা ব্যালকনির মুখে চলে এল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠল। একটা নকশা করা ট্রাঙ্গুলার পিলারের পাশে যে টেবিলটা রয়েছে, তার ওপর ওদের নাম লেখা রয়েছে। পাশে একটা বোর্ডে লেখা 'রিজার্ভড'।

পিলারের আড়াল থাকার জন্য সহজে কেউ তাদের দেখতে পাবে না, তাদের কথা-টথা কেউ শুনতে পাবে না। অথচ তারা সবাইকে দেখতে পাবে। এখান থেকে নিচের দৃশ্যটা পুরো চোখে পড়ে।

টেবিলটা দেখে খুবই খুশি মৃন্ময়। উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, 'ফাইন। বোসো।'

দু'জন মুখোমুখি বসল। সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে স্মার্ট চেহারার একজন স্টুয়ার্ড দৌড়ে এল। সুদৃশ্য বইয়ের মতো ছাপানো মেনু মৃন্ময়দের টেবিলে রেখে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আরাম করে বসবার জন্য মৃন্ময়দের একটু সময় দিচ্ছে। মিনিট পাঁচ সাতেক বাদে এসে অর্ডার নিয়ে যাবে।

টেবিলের ওপর ন্যাপকিন, খাবার জলের গেলাস, ফর্ক-চামচ, সব কিছু সাজানো রয়েছে।

নিচের ডায়াসে শরীরে দুর্দান্ত যৌবন নিয়ে যে মেয়েটা উদ্দাম প্রেমের গান গাইছে, তার গলায় উগ্র নেশার মতো ঝাঁঝালো একটা ব্যাপার আছে। সে গাইছিল ঃ

'লাভ লাভ লাভ
লাভ ইজ নারকোটিক, লাভ ইজ ম্যাজিক,
মাই ডার্লিং কামস ডাউন ফ্রম হনলুলু।
লাভ লাভ লাভ।'

ঘাড় বাঁকিয়ে নিচে তাকায় মৃন্ময়। ভালো করে কয়েক সেকেণ্ড গানটা শুনে সুদীপার দিকে ফিরে বলল, 'দারুণ গাইছে মেয়েটা।'

আধফোটা গলায় সুদীপা কী বলল, বোঝা গেল না।

মৃন্ময় ফের বলল, 'গলাটা একটু হাস্কি। কিন্তু দুরন্ত সেক্স অ্যাপীল রয়েছে, তাই না?'

সুদীপা উত্তর দিল না।

এলোমেলো দু'একটা কথার পর মৃন্ময় জিজ্ঞেস করল, 'আগে কী খাবে

বল— জীন না বীয়ার?'

সুদীপার যে টাইপের কাজ, তাতে তাকে নানা ধরনের পার্টিতে যেতে হয়। ম্যানার্সের জন্য একটু-আধটু ড্রিংকও করতে হয়। তবে হুইস্কি-টুইস্কি নয়—জীন বা বীয়ার। ড্রিংকের ব্যাপারে তার কোনো রকম শুচিবাই নেই।

প্রথম প্রথম পার্টিতে গিয়ে খুবই অসুবিধা হত। সবাই যখন ড্রিংকের জন্য রিকোয়েস্ট করলো, সে হাত গুটিয়ে রাখত। বাবাকে সে কথা জানাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের যা বিজনেস, তাতে ড্রিংকটা এসেই যায়। ভদ্রতা আর সঙ্গ দেবার জন্য যেটুকু দরকার, ঠিক সেইটুকুই করবে, নইলে ব্যবসা বড় করা আজকের ওয়ার্ল্ডে সম্ভব না। তবে কখনও অ্যাডিক্ট হয়ে যেও না।'

কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই ভালো লাগছে না সুদীপার। অন্যমনস্কর মতো সে বলল, 'যা ইচ্ছা।'

কী ধরনের পানীয় সুদীপার পছন্দ, মৃন্ময় তা জানে। স্টুয়ার্ডকে ডেকে সে বীয়ার দিতে বলল।

বেয়ারাকে দিয়ে বীয়ার আনিয়ে দিল স্টুয়ার্ড। ফেনিস গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে মৃন্ময় বলল, 'খাবারের অর্ডারটা দিয়ে দিই। তৈরি করতেও তো সময় লাগবে। যা খাবে মেনু দেখে বলে দাও।'

'তুমিই বল।'

'এখানে চিকেন-তন্দুরি আর ক্রীম-বেকটিটা চমৎকার বানায়। ওটা বলে দিই। সেই সঙ্গে সুইট-সাওয়ার ফিশ, ফ্রায়েড প্রন, স্যালাড আর সুইট ডিশ।
'

অর্ডার নিয়ে স্টুয়ার্ড চলে গেল। নিচের ডায়াসে মাইক হাতে গাইয়ে মেয়েটা গানের সঙ্গে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে এখন নাচতেও শুরু করেছে। সেই সঙ্গে ঝড়ের বেগে অর্কেস্ট্রা বেজে যাচ্ছে।

উদ্দাম নাচ গান এবং বাজনা এত বড় রেস্তোরাঁটায় আশ্চর্য এক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে যেন। কেউ পা ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে, কেউ হাততালি দিচ্ছে। আর যাদের পাকস্থলীতে হুইস্কিটা একটু বেশি পরিমাণে ঢুকে গেছে তারা জড়ানো গলায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ করে উঠছে। এগুলো যুগপৎ নেশা এবং উচ্ছ্বাসের প্রকাশ।

চারপাশে এত শব্দ কিন্তু কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না সুদীপা। এই বিশাল রেস্তোরাঁ, লাঞ্চ টাইমে প্রচণ্ড ভিড়—কিছুই যেন তার চোখে পড়ছে না। সেই মারাত্মক চিঠিটা চোখের সামনে সিনেমা স্লাইডের মতো ফুটে উঠছে।

এত আওয়াজের মধ্যেও আবছাভাবে সুদীপা টের পাচ্ছে, টেবিলের ওধার

থেকে অনেকখানি ঝুঁকে অনবরত কিছু বলে যাচ্ছে মৃন্ময়। কিন্তু তার একটি বর্ণও সে শুনতে বা বুঝতে পারছে না।

এমন সময় নিচে গান-টান বন্ধ হল। লাঞ্চের জন্য এটা সাময়িক বিরতি। আর ঠিক তখনই একটা বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। গরম লোভনীয় সব খাদ্য প্লেটে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মৃন্ময় বলল, 'এসো শুরু করা যাক।' বলে চিকেন তন্দুরির একটা টুকরো মুখে পুরে দিল।

কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে সুদীপার কোনরকম উৎসাহ দেখা গেল না। বুকের ভেতরকার সেই পাপবোধটা তাকে যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার শ্বাস আটকে আটকে আসতে লাগল।

মৃন্ময় খাওয়া থামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড সুদীপাকে লক্ষ্য করল। বলল, 'এ কী, চুপ করে বসে আছ। খাও।'

চমকে সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ, খাচ্ছি।' টেবিল থেকে একটা চামচ আর ফর্ক তুলে নিলে সে। তারপর ক্রিম-বেকটি থেকে খানিকটা কেটে মুখে দিল। কিন্তু অনেক দিন জ্বরে ভোগার পর যেমন হয়, মুখের ভেতরটা অবিকল সেই রকম হয়ে গেছে। কী খাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না। মাছের টুকরোটা বিস্বাদ শুকনো রবারের মতো মনে হচ্ছে।

একটু পর মৃন্ময় ডাকল, 'রঞ্জু—'

'বল।'

'একটা ব্যাপার প্রথম থেকেই আজ মার্ক করছি। তুমি ভীষণ আনমাইণ্ডফুল। তখন বললে শরীর খারাপ হয় নি। তবে কি অন্য কোনরকম প্রবলেম হয়েছে?'

'কই, না—' আস্তে মাথা নাড়ল সুদীপা, 'কোনো প্রবলেম হয় নি।'

তা হলে এত চুপচাপ কেন? তুমি তো কত লাইভলি, ফুল অফ এনার্জি। কিন্তু আজ নিজের থেকে একটা কথাও বলছ না। সারাক্ষণ কী ভাবছ!'

বেনামা চিঠিটা পাওয়ার পর তার মধ্যে যে প্রচণ্ড তোলপাড় চলছে, তা কি সবার কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে? সুদীপা বলল, 'না না, কী আর ভাবব?'

'তোমার বাবার শরীর ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ঠাকুমা?'

'ঠিক আছেন।'

'বিজনেসের দিক থেকে কোনো খারাপ খবর নেই তো?'

'না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর একসময় মৃন্ময় খুব আস্তে করে ডাকল, 'রঞ্জু—'

সুদীপা আবছা গলায় সাড়া দিল।

মৃন্ময় বলল, 'এবার বল।'

'কী বলব?' সুদীপা মৃন্ময়ের মুখের দিকে তাকাল।

'যা শোনার জন্যে পাঁচটা বছর অপেক্ষা করে আছি।'

মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সুদীপা।

একেবারে হকচকিয়ে গেল মৃন্ময়। বলল, 'কী হল রঞ্জু, কী হল তোমার?'

সুদীপা বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর মৃন্ময়। আজ তোমাকে কিছুই বলতে পারছি না—' বলে আর দাঁড়াল না, নিশি-পাওয়া মানুষের মতো টেবিলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে একরকম দৌড়েই সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

মৃন্ময় পেছন থেকে ডাকল, 'রঞ্জু, রঞ্জু—'

সুদীপা ফিরেও তাকাল না। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল, তারপর সোজা বাইরে দরজার দিকে ছুটল। চারদিকের টেবিল থেকে সবাই যে অবাক চোখে লক্ষ্য করছে, সেদিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

মৃন্ময়ও ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এসেছিল। কিন্তু সুদীপাকে ধরা গেল না। ততক্ষণে বাইরে চলে গেছে সে।

পাঁচ।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতেই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেল সুদীপা। হাত তুলে থামিয়ে ভেতরে উঠতে উঠতে বলল, 'ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেন।'

পার্ক স্ট্রীট পেছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সিটা ক্যামাক স্ট্রীটে এসে পড়ল। তারপর সার্কুলার রোড, গুরুসদয় রোড হয়ে সোজা ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনের কাছে এসে ট্যাক্সিওলা জিজ্ঞেস করল, 'আভি কীধর যায়েগা?'

আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল সুদীপা। চমকে উঠে বলল, 'বাঁ দিকে যান, তারপর ডাইনে।'

নির্দেশ অনুযায়ী ট্যাক্সিটা দু'তিন মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনে এসে থামল। বিশাল গেটটার ওধারে দারোয়ান বসে ছিল। সুদীপাকে এই দুপুর বেলা ট্যাক্সি করে ফিরতে দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল। কেন না, এ সময় কখনও সুদীপা ফেরে না, তা ছাড়া ট্যাক্সিতে চলাফেরার অভ্যাসও তার নেই। বিস্ময় একটু থিতিয়ে এলে লাফ দিয়ে উঠে দারোয়ান গেট খুলে দিল।

সুদীপা ট্যাক্সিটা আর ভেতরে নিয়ে গেল না। ওখানেই ভাড়া-টাড়া মিটিয়ে

লন এবং বাগানের মাঝখানের নুড়ির রাস্তাটা দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভেতর চলে গেল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তেতলায় এসে শাড়িটাড়ি সুদ্ধু নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দিল।

এই দুপুর বেলায় বাড়িটা একেবারে নিঝুম। সুদীপা জানে, খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা আর ঠাকুমা ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোয়। দারোয়ান আর মালীরা ছাড়া বাড়ির অন্য সব কাজের লোকেরা কেউ ঘুমোয়, কেউ বাইরে আড্ডা-টাড্ডা দিতে যায়।

মাঝে মধ্যে বাগানের গাছপালার মাথা থেকে পাখিদের ডাক ভেসে আসছে। রাস্তায় ক্কচিৎ দু'একটা গাড়ির আওয়াজ। কলকাতার মতো আশি লক্ষ মানুষের বিশাল মেট্রোপলিস জুড়ে যখন দিনরাত শুধু শব্দ আর শব্দ, টগবগে উত্তেজনা আর টেনশান, সেখানে এই অভিজাত পাড়াটাতে দুপুরবেলায় কেউ যেন আশ্চর্য কোনো ম্যাজিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

বালিশে মুখ গুঁজে কতক্ষণ পড়ে ছিল, সুদীপার খেয়াল নেই। শুধু টের পাচ্ছিল চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে।

একসময় মাথায় কার হাতের ছোঁয়া পেতেই চমকে উঠল সুদীপা। দেখল, হেমনলিনী খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে বাবা।

দুটো স্ট্রোকের পর উমাপ্রসাদের সিঁড়ি ভাঙা বারণ। গত পাঁচ-ছ' বছরে একবারও তিনি তেতালায় ওঠেন নি। দ্রুত চোখ-টোখ মুছে সুদীপা বলল, 'এ কি বাবা, তুমি তেতালায় উঠলে যে! সিঁড়ি ভেঙে একটা কাণ্ড বাধাতে চাও!'

উত্তর না দিয়ে উমাপ্রসাদ বললেন, 'তুই এ সময় বাড়িতে চলে এলি যে?'

সুদীপা উত্তর দিল না।

উমাপ্রসাদ ফের বললেন, 'দারোয়ান এসে ঘুম থেকে আমাদের তুলে খবর দিল, তুই নাকি ট্যাক্সি করে চলে এসেছিস।'

সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ।'

উদ্বিগ্ন মুখে উমাপ্রসাদ বললেন, 'কী হয়েছে?'

সুদীপা চুপ।

হেমনলিনী অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, 'কী হইছে ক রঞ্জু। চুপ কইরা থাকিস না।'

উমাপ্রসাদ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃন্ময় কি লাঞ্চে আসে নি?'

'এসেছিল।'

'বিয়ের ব্যাপারে কি পিছিয়ে যেতে চাইছে? কিন্তু ওর আগ্রহই তো বেশি ছিল।'

'না-না—' শ্বাসরুদ্ধের মতো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুদীপা। বলল, 'মৃন্ময় ঠিক আছে। ও খুবই অনেস্ট ছেলে।'

'তা হবে?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সুদীপা। তারপর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে টাইপ-করা সেই কাগজটা বার করে উমাপ্রসাদের হাতে দিতে দিতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'এটা দেখ।'

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এটা?'

'পড়লেই বুঝতে পারবে।'

হেমনলিনী অস্থিরভাবে একবার ছেলে, আরেকবার নাতনীকে দেখতে দেখতে বললেন, 'কী ঐটা?'

কেউ উত্তর দিল না।

চিঠিটা পড়তে পড়তে অদ্ভুত এক আতঙ্কে সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল উমাপ্রসাদের। অসহ্য কোনো যন্ত্রণায় তাঁর হাত-পা কাঁপছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে নতুন করে আরেকটা স্ট্রোক হয়ে যাবে। দু'হাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো মেয়ের বিছানার একধারে বসে পড়লেন। ভাঙাচোরা জড়ানো গলায় বললেন, 'এতবড় শত্রুতা কে করল?'

দমবন্ধ গলায় হেমনলিনী বললেন, 'কিসের চিঠি, আঁ, কি রে নান্টু?' নান্টু উমাপ্রসাদের ডাকনাম।

কেউ উত্তর দিল না।

গভীর উৎকণ্ঠায় হেমনলিনী বলে যেতে লাগলেন, 'তোরা চুপ কইরা থাকিস না। কী হইছে ক!'

অনেকক্ষণ পর রুদ্ধশ্বাসে চিঠিটায় যা লেখা আছে জানিয়ে দিলেন উমাপ্রসাদ। সব শুনে হেমনলিনী কেঁদেই ফেললেন, 'কে এমুন ক্ষতিটা করল! এত বড় শত্তুর কে?'

'জানি না মা।'

'এতকাল মাইয়াটা বিয়াতে রাজী হয় নাই। যদিও হইল, তার ভিতরে এই বিপদ। অখন কী করবি নান্টু?'

উমাপ্রসাদ বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু ভেবে দেখি।'

হেমনলিনী সুদীপার পাশে বসে গভীর স্নেহের গলায় বললেন, 'মনে সাহস আন দিদি। সব ঠিক হয়ে যাইব।'

ঠাকুমার দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল সুদীপা। কিছু বলল না।

হেমনলিনী খানিকটা ঝুঁকে নাতনীকে লক্ষ্য করতে করতে এবার বললেন,

'ইস. মুখখান শুকাইয়া এতটুক হইয়া গেছে। মৃন্ময়ের লগে (সঙ্গে) দুফইরে (দুপুরে) তো হোটেলে খাওনের কথা আছিল। নিচেয় খাওয়া হয় নাই।'

'না।' খুব আস্তে আধফোটা গলায় বলল সুদীপা।

হেমনলিনী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'আহা রে, ওঠ ওঠ। খাইতে চল।'

উমাপ্রসাদও খাওয়ার কথা বার বার বললেন।

সুদীপা বলল, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না। তোমরা নিচে গিয়ে রেস্ট নাও। আমি একটু একলা থাকি।'

।। ছয় ।।

কিছুক্ষণ আগে উমাপ্রসাদ আর হেমনলিনী নিচে নেমে গেছেন। বিছানা থেকে এখনও ওঠে নি সুদীপা। বালিশে চিবুক রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

আকাশের ঢালু গা বেয়ে বেয়ে আশ্বিনের সূর্য এখন পশ্চিমে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদে ক্রমশঃ হলুদ হয়ে আসছে। নিচের বাগানে পাখিদের ওড়াউড়ি আর ডাকাডাকি অনেক বেড়ে গেছে। দূরে যে রাস্তাটা এতক্ষণ ঝিম মেরে পড়েছিল, সেখানে বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে। দু'একটা ফেরিওলা গলায় অদ্ভুত আওয়াজ করে করে ঘুমন্ত পাড়াটাকে যেন জাগিয়ে তুলছে। আইসক্রিওয়ালা আর ইস্তিরিওয়ালা তাদের গাড়ি ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনের এই রাস্তা জুড়ে এখন বিচিত্র অর্কেস্ট্রা বেজে যাচ্ছে।

চারপাশের এত শব্দ বা দৃশ্য, কিছুই সুদীপাকে যেন ছুঁতে পারছিল না। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা সতের-আঠার বছর পেছনে চলে গেল। তখন ক্লাস নাইনে বা টেনে পড়ে সে।

সেই সময় বাবার স্বাস্থ্য ছিল দুর্দান্ত। দিনে সতের-আঠার ঘণ্টা খাটতেন। নবজীবন হাউসিং কনসার্নের বিজনেস লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। বাড়িতে গাড়ি ছিল দুটো। কিন্তু সুদীপাকে বাসে-ট্রামে করেই একা একা স্কুলে যেতে হয়। এই নিয়ে হেমনলিনী ছেলেকে যথেষ্ট বকাবকি করতেন। কিন্তু বাবা কিছুতেই সুদীপাকে গাড়ি করে স্কুলে পাঠাতেন না।

আসলে উমাপ্রসাদ মেয়েকে মোমের পুতুল বানাতে চান নি। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে ট্রামে-বাসে ঘুরে পৃথিবীকে চিনতে শিখুক সে। সব রকম অবস্থার উপযোগী করে প্রথম থেকেই নিজেকে তৈরি করে নিক। জীবন তো সরলরেখা নয়। চিরকাল একভাবে এক নিয়মে কারো নাও কাটতে পারে। কম বয়স থেকে সব রকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকলে পরে আর কষ্ট পেতে হয় না। ঠাকুমা শেষ পর্যন্ত স্কুলবাসের ব্যবস্থা

করে দিতে বলেছিলেন। বাবা রাজি হন নি। তাঁর মতে স্কুলবাস আর বাড়ির গাড়িতে তফাৎ খুব একটা নেই। কাজেই স্কুল ইউনিফর্ম পরা সুদীপা রোজই কাঁধে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে দক্ষিণ দিকের ঐ রাস্তাটা দিয়ে বাঁয়ে ঘুরে বড় রাস্তায় চলে যেত। সেখান থেকে ট্রাম বা বাস ধরত।

ষোল-সতের বছর আগেও এদিকে এত বাড়ি-টাড়ি হয় নি। সুদীপাদের এই জায়গাটুকু বাদ দিলে চারপাশে ইদানিং হাই-রাইজ বিল্ডিং উঠতে শুরু করেছে। তখন কিন্তু ফাঁকা জায়গা ছিল আরো বেশি। দু-চারটে বস্তি টাইপের টিনের বাড়িও চোখে পড়ত।

সুদীপাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা যেখানে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, সেখানে ছিল টিনের চালের পুরনো ক'টা বাড়ি। পাঁচ ইঞ্চি পুরু ইটের দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে গিয়েছিল। সামনের সারি বারান্দাগুলোর সিমেন্ট ফেটে কবেই চৌচির। বাড়িগুলোর উল্টো দিকে ছিল একটা ছোট চায়ের দোকান। পুরনো অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় দু-তিনটে বেঞ্চ পেতে খদ্দেরদের বসবার ব্যবস্থা ছিল। একধারে উনুন, তার পাশে চা তৈরির নানারকম সরঞ্জাম। এ সবের গা ঘেঁষে একটা কাঠের র‍্যাকে সারি সারি বোয়মে বিস্কুট সাজানো থাকত। তারের বাস্কেটে থাকত ডিম।

স্কুলে যাতায়াতের সময় প্রায় রোজই সুদীপা দেখত, একটা বাইশ তেইশ বছরের যুবক সমবয়সী একদল ছেলে নিয়ে হয় টিনের বাড়ির রোয়াকে, নইলে চায়ের দোকানে বসে আছে।

পাতলা ধারালো চেহারা যুকবটার, কাটাকাটা মুখ, তীক্ষ্ণ থুতনি, ঘন ভুরু, মাঝারি ধরনের চোখে উগ্র চাউনি। চুলগুলো সর্বক্ষণই অবহেলায় পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। গালে তিন-চার দিনের খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে আধমলা টাইপ ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট। শার্টের দু-একটা বোতাম কখনই থাকত না।

ছেলেটার নাম রণবীর। নামটা কার কাছে সুদীপা শুনেছিল, এতদিন বাদে মনে নেই। নামই না, তার সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু শুনেছিল সে। মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ, বেপরোয়া এবং চোয়াড়ে। কথায় কথায় মারদাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। কারণে-অকারণে হল্লা করে। তাদের এই অভিজাত এলাকার অনেকেই তাকে অ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্ট বলত।

সুদীপা বেশ সাহসী মেয়ে। অল্প বয়স থেকেই তার মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। রণবীর সম্পর্কে নানারকমের বাজে 'মিথ' শুনেও তাকে সে যে ভয় পেত তা ঠিক নয়। তবে কেমন যেন একটা অস্বস্তি তার মধ্যে কাজ করত। স্কুলে যাওয়া-আসার সময় কখনও রণবীরদের দিকে

তাকাত না সুদীপা। সোজা সামনে চোখ রেখে চায়ের দোকানের ঐ জায়গাটা পেরিয়ে যেত।

রণবীর সম্পর্কে নানারকম ব্যাপার শোনা গেলেও, মেয়েদের পেছনে লাগার কথা কখনও শোনা যায় নি। সুদীপা একাই না, ও পাড়ার অনেক মেয়েই ঐ রাস্তা দিয়ে স্কুল-কলেজে যেত কিন্তু কোনদিন সে কাউকে বিরক্ত তো করেই নি, কারো দিকে তাকিয়ে দ্যাখে নি পর্যন্ত।

যাই হোক, হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে কেয়ার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। আর কেয়ার জন্যই রণবীরের সঙ্গে যোগাযোগ। কিন্তু রণবীরের কথা পরে।

কেয়ার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তার মুখটা সুদীপার চেনা। ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনের রাস্তায়-টাস্তায় আগেই তাকে দেখেছে। স্মার্ট ঝকঝকে চেহারার মেয়ে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা।

কলেজে একই দিনে একই সময়ে কেয়া আর সে বি.এস.সিতে ভর্তি হয়েছিল। দু'জনেরই এক কম্বিনেশন। অনার্সও তাদের এক—ফিজিক্স।

অফিসে ফীয়ের টাকা জমা দিয়ে বাইরে আসতেই সুদীপা দেখল কেয়া করিডরে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আগেই টাকা জমা দিয়েছে।

সুদীপাকে দেখে একটু হেসে কেয়া বলেছিল, 'তোমার জন্যেই ওয়েট করছি।'

কিছুটা অবাক হয়ে কেয়ার দিকে তাকিয়েছিল সুদীপা।

সুদীপার বিস্ময়ের কারণটা বুঝতে পেরে কেয়া এবার বলেছিল, 'আমি তোমাকে চিনি। তোমার নাম সুদীপা। পার্কের কর্নারে তেতলা বাড়িটা তোমাদের।'

আস্তে মাথা নেড়েছিল সুদীপা।

একটা ইংলিশ-মিডিয়াম মিশনারি স্কুলের নাম করে কেয়া আবার বলেছিল, 'তুমি তো ওখান থেকে পাশ করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'স্টার পেয়েছ?'

সুদীপার বিস্ময়টা ক্রমাগত বাড়ছিলই। সে বলেছিল, 'হ্যাঁ। তুমি কী করে জানলে?'

কেয়া বলেছিল, 'তোমার মতো ভালো মেয়েদের কথা জানতে অসুবিধা হয় নাকি?'

সুদীপার এবার খুব লজ্জা হচ্ছিল। তার সম্বন্ধে এত খবর জানে মেয়েটা অথচ ওর বিষয়ে সব কিছুই তার অজানা। সে বলেছিল, 'একটা কথা বলব,

কিছু মনে করবে না তো?'

সুদীপার মনের কথা বুঝে নিয়ে কেয়া এবার বলেছিল, 'তুমি কী বলবে, আমি জানি। আমার সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানো না—এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কেয়া। তোমাদের পাড়াতেই থাকি।'

'কোন স্কুল থেকে পাশ করেছ?'

একটা নামকরা বাংলা-মিডিয়াম স্কুলের নাম করেছিল কেয়া।

সুদীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার টোটাল কত হয়েছে?'

'তোমার মতো নয়। সাতশো সাতচল্লিশ।'

'মোটে তিন নম্বরের জন্যে স্টারটা পেলে না! ভেরি স্যাড।'

কেয়া হেসেছিল, 'কী আর করা যাবে। এখন বাড়ি ফিরবে তো?'

সুদীপা বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'চল, একসঙ্গে যাওয়া যাক। আমিও বাড়ি ফিরব।'

বাসে মাণ্ডেভিল গার্ডেনের কাছে নেমে মেইন রোড থেকে সরু রাস্তায় ঢুকে সেই টিনের ঘরগুলো আর চায়ের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কেয়া।

সুদীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখানে দাঁড়ালে যে?'

কেয়া বলেছিল, 'এখানেই তো থাকি।' বলে টিনের ঘরগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে নিয়েছিল, 'ঐ যে আমাদের বাড়ি।'

রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল সুদীপা। সেই সঙ্গে এক ধরনের অস্বস্তিও হচ্ছিল তার। যে বাড়িতে রণবীরের মতো অ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্ট থাকে সেখানে কেয়ার মতো ব্রাইট ঝকঝকে মেয়ে কী আর থাকতে পারে, এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না সে। আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বলেছিল, 'চলি।'

এর পর সেসন শুরু হলে প্রায় রোজই দু'জনে একসঙ্গে কলেজ যেত, ফিরতও একই সঙ্গে। কেননা, দু'জনের কম্বিনেশন এক হওয়ায় তাদের ক্লাস থাকত একই সময়, ছুটিও তাই।

কলেজে গল্প করার সময়-টময় পাওয়া যেত না। রোজই পাঁচ-ছ'টা করে ক্লাস, তারপরও অনার্সের মেয়েদের জন্য টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা। ফাঁকে টাঁকে দু'একটা অফ পিরিয়ড থাকলে দু'জনে লাইব্রেরিতে চলে যেত। রেফারেন্সের বই-টই খুলে নোট নিত। কেয়া আর সুদীপা পড়াশোনার ব্যাপারে ছিল ভীষণ সিরিয়াস। একেবারে গোড়া থেকেই ফার্স্ট ক্লাসের জন্য তৈরি হতে শুরু করেছিল ওরা।

কলেজে একটা সেকেণ্ডও নষ্ট না করুক, ফেরার সময় কিন্তু প্রচুর গল্প করতে করতে আসত তারা।

কোনদিন কেয়া বলত, 'তুমি তো দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও, তাই না?'

সুদীপা অবাক হয়ে বলত, 'দারুণ-টারুণ না, তবে গাই। মানে শিখছি।'

একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়ের নাম করে কেয়া এবার বলেছিল, 'তুমি তো এঁর কাছে গান শেখো?'

'হ্যাঁ।'

'সপ্তাহে তিন দিন এসে উনি তোমাকে শেখান?'

'হ্যাঁ।'

কোনদিন কেয়া বলত, 'তুমি তো খুব ভাল আঁকতে পার।'

সুদীপা বলেছে, 'ভালো আর কোথায়। চেষ্টা করি।'

'একজন ফেমাস আর্টিস্ট উইকে দু'দিন এসে তোমাকে আঁকা শিখিয়ে যান।'

অবাক বিস্ময়ে সুদীপা বলেছে, 'আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি কী করে জানলে?'

'জানি।' কেয়া রহস্যময় গলায় বলছে, 'জানাবার লোক আছে।'

'শার্লক হোমস কি হারকিউল পয়রোর মতো কোনো ডিটেকটিভকে আমার পেছনে লাগিয়ে রেখেছ নাকি?'

উত্তর না দিয়ে মজা করে কেয়া বলেছে, 'আমি লাগাই নি। নিজেই সে লেগে রয়েছে।'

'কে সে।'

'জানতে পারবে। তবে এখন না।'

গল্প করতে করতে কেয়াদের বাড়ির কাছাকাছি এসে আর দাঁড়ায় না সুদীপা, সোজা এগিয়ে যেত। বেশির ভাগ দিনই চোখে পড়ত টিনের বাড়ির রোয়াকে বা চায়ের দোকানে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বসে আছে রণবীর। কোনো কোনো দিন আবার তাকে দেখা যেত না।

সুদীপা লক্ষ্য করেছে, রণবীর রোয়াকে-টোয়াকে থাকলে তার দিকে ফিরেও তাকাত না। এমন কি কেয়ার সঙ্গেও তার আচরণ ছিল অপরিচিতের মতো। একই বাড়িতে থাকে অথচ সে যেন তাকে চেনেই না—এমন একটা ভাব নিয়ে বসে থাকত। কেয়ার সঙ্গে রণবীরের কী সম্পর্ক, আদৌ কিছু আছে কিনা, জানবার জন্য কৌতূহল ছিল সুদীপার। কিন্তু কখনও তা জিজ্ঞেস করত না। সব আগ্রহই তো মুখ ফুটে জানাবার নয়। শোভনতা অশোভনতার একটা প্রশ্নও তো আছে।

একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় বাসস্টপে নেমে বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ কেয়া বলেছিল, "একটা কথা বলব সুদীপা?"

সুদীপা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই।'

'রোজই ভাবি কিন্তু বলতে সাহস হয় না।'

'কী আশ্চর্য, বলেই ফেল না।'

'আমার একটা রিকোয়েস্ট তোমাকে রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে, রাখব। রিকোয়েস্টটা না জেনেই তোমাকে কথা দিলাম।'

'আমাদের বাড়ি তোমাকে আজ একটু যেতে হবে। মাকে তোমার কথা অনেক বলেছি। ক'দিন ধরেই মা তোমাকে নিয়ে যেতে বলছেন কিন্তু কিছুতেই সাহস হচ্ছিল না।'

সুদীপা চমকে উঠেছিল। কেয়াদের বাড়ি যাবার কথা কোনদিন সে ভাবে নি। তা ছাড়া অ্যান্টি-সোসাল রণবীরকে নিয়ে যে বিশ্রী 'মিথ'টা রয়েছে, সেটা তার মধ্যে অনেকদিন ধরেই একটা বিদ্রূপতা তৈরি করে রেখেছে।

কেয়া আবার বলেছিল, 'আসলে তোমরা এত বড় লোক আর আমরা এত গরিব—'

সুদীপা এবার দ্বিধা কাটিয়ে বলেছে, 'প্লীজ, ওরকম বাজে কমপ্লেক্স ছাড়ো তো। চল, মাসীমার সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

খুশিতে মুখ আলো হয়ে উঠেছিল কেয়ার। সুদীপার একটা হাত ধরে গভীর গলায় বলেছিল, 'এসো ভাই।'

কেয়াদের বাড়িতে সব মিলিয়ে তিনটে ঘর। ইংরেজি 'এল' শেপের মতো বাড়িটা। সামনে রাস্তার দিকে পাশাপাশি দুটো ঘর, বাকি ঘরটা ভেতরে ডান দিকে।এ ছাড়া বাথরুম, কিচেন ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। ছোট্ট চৌকো মতো ফাঁকা একটুকরো জমিও আছে। সেখানে দু'-চারটে ফুলের গাছ।

বাড়ির বাইরের দিকটা ভাঙাচোরা হতচ্ছাড়া চেহারার হলেও ভেতরটা তেমন নয়। ঘরগুলো তকতকে। এক কণা ধুলো কোথাও পড়ে নেই।

কেয়া প্রায় চিৎকার করতে করতেই বাড়িতে ঢুকেছিল, 'দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি।'

একটা ঘর থেকে গোলগাল আদুরে চেহারার এক বর্ষীয়সী মহিলা বেরিয়ে এসেছিলেন। লালপাড় মিলের শাড়ি পরনে, সামান্য ঘোমটা টানা, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড সিদুঁদের টিপ, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। হাতে ধবধবে শাঁখা, রুপো বাঁধানো লোহা, গলায় পাতলা জিলজিলে সোনার হার আর কানে দুটো পাথর-বসানো কানফুল। বড় বড় ভাসা ভাসা দু'টি চোখ আর মুগ্ধ স্নেহের রসে যেন ভাসো ভাসো। এক পলক দেখেই টের পাওয়া যায়,

এই মানুষটি কারো ওপর রাগ করতে জানেন না, কাউকে বকতে পারেন না। সর্বাঙ্গে অসীম কোমলতা নিয়ে এই পৃথিবীতে তিনি বেঁচে আছেন।

স্নিগ্ধ হেসে কেয়ার মা বলেছিলেন, 'তুমি সুদীপা! কী সুন্দর মেয়ে! সব সময় রুনকির মুখে তোমার কথা।' কেয়ার ডাকনাম রুনকি।

সুদীপা পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই কেয়ার মা তার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে মেয়েকে বলেছিলেন, 'বন্ধুকে তোর ঘরে নিয়ে যা।'

সুদীপা বলেছিল, 'আজ আর বসব না মাসীমা। বাড়িতে তো বলে আসি নি। দেরি হলে ঠাকুমা ভাববেন।'

'তাই কখনও হয়। প্রথম দিন এলে, একটু মিষ্টি-টিষ্টি না খেয়ে গেলে আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।'

এর পর আর কিছু বলার নেই। কেয়ার সঙ্গে তার ঘরে যেতে হয়েছিল।

ঘরটা চমৎকার। দামী আসবাব-টাসবাব অবশ্য নেই। একধারে তক্তপোশে ধবধবে বিছানা পাতা। আরেক ধারে সস্তা টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপর কেয়ার পড়ার বই-টই আর খাতা যত্ন করে সাজানো। বাঁ দিকে একটা কাচের আলমারিতে প্রচুর বই। রবীন্দ্র রচনাবলী, সেক্সপীয়ারের নাটকের সেট, বিখ্যাত সব বিদেশী ক্লাসিক।

কেয়ার বিছানায় বসে চারদিক দেখতে দেখতে সুদীপা বলেছিল, 'তোমার ঘরটা ভারী সুন্দর।'

কেয়া হেসে বলেছিল, 'সার্টিফিকেটটা মায়ের পাওনা। মা-ই সব গুছিয়ে-টুছিয়ে দেয়।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই প্লেটে করে সুদীপা এবং কেয়ার জন্য ঘরে তৈরি নারকোলের চন্দ্রপুলি নিয়ে এসেছিলেন কেয়ার মা। বলেছিলেন, 'খাও মা।'

চন্দ্রপুলি দেখে লজ্জা পেয়েছিল কেয়া। খুঁতখুঁতে গলায় বলেছিল, 'সুদীপাকে এসব দিলে!'

'ও তো বন্ধু, বলতে গেলে আমার মেয়েই। ওর সঙ্গে ভদ্রতা করব নাকি! ঘরে যা আছে তা-ই খাবে।' বলে হেসে হেসে সুদীপার দিকে ফিরেছিলেন কেয়ার মা, 'তাই না রে মা?'

তাঁর সহজ আন্তরিক ব্যবহার এবং কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সুদীপা। ব্যস্তভাবে বলেছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' বলেই চামচে দিয়ে চন্দ্রপুলির একটা টুকরো কেটে মুখে পুরে দিয়েছিল।

খেতে খেতে নানরকম কথা হয়েছিল। সুদীপাদের বাড়িতে কে কে আছেন, বাবা কী করেন, দেশ কোথায় ছিল ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন কেয়ার মা। তারপর এক সময় উঠতে উঠতে বলেছিলেন, 'তোরা দুই বন্ধু

গল্প কর। অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে। আমি এখন যাই রে সুদীপা।'

সুদীপা বলেছিল, 'আমিও এবার যাব মাসীমা।'

কিন্তু তক্ষুণি তাকে যেতে দেয় নি কেয়া। আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে সুদীপা যখন উঠতে যাবে, সেই সময় ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে কেন যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মুখ ফিরিয়েই চমকে উঠেছিল সুদীপা—রণবীর।

গভীর চোখে কয়েক সেকেণ্ড সুদীপাকে দেখেছিল রণবীর। তারপর কেয়াকে বলেছিল, 'ও, তোরা—' বলে আর দাঁড়ায় নি। বারান্দা দিয়ে ডাইনে চলে গিয়েছিল।

কেয়া বলেছিল, 'কিছু বলবি?'

বারান্দার ওধার থেকে রণবীর বলেছিল, 'তেমন কিছু না। পরে শুনিস।

এ বাড়িতে আসার পর কেয়ার মায়ের আন্তরিকতা এবং সাবলীল ব্যবহারে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল সুদীপা। মহিলা তার মধ্যেকার জড়তা এবং সঙ্কোচ মুছে দিয়েছিলেন। কিন্তু রণবীরকে দেখেই অনেক কালের সেই পুরনো অস্বস্তিটা আবার যেন টের পেতে শুরু করেছিল।

এই সময় কেয়া বলেছিল, 'আমার দাদা।'

ঐ রকম একটা সমাজবিরোধী টাইপের ছেলে কেয়ার মতো মেয়ের দাদা হতে পারে, এটা ভাবতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল সুদীপার। তার কথায় উত্তর না দিয়ে দ্রুত উঠে পড়েছিল সে, বই-টইয়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বেরুতে বেরুতে বলেছিল, 'চলি কেয়া।'

'আরেকটু বসবি না?'

'না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

কেয়া সুদীপার সঙ্গে তাদের বাড়ির কাছাকাছি সেই পার্কটা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল। রণবীরকে দেখার পর থেকে তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তা বুঝতে পারে নি কেয়া। সে বলেছিল, 'আমার দাদাকে আগে দেখেছিস নিশ্চয়ই।'

রুক্ষ গলায় সুদীপা বলেছিল, 'দেখেছি। রাস্তায়, না হলে চায়ের দোকানে বসে থাকে।'

'তখন শার্লক হোমস আর হারকিউল পয়রোর কথা বলছিলি না? আমার দাদা হল তাই। তোর সঙ্গে আলাপ-টালাপ হবার আগে দাদার কাছে তোর সব খবর পেয়েছি।'

এতটা ভাবতে পারে নি সুদীপা। তার মুখ চোখ ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু

করেছিল। কেয়া আবার কী বলতে যাচ্ছিল. তাকে থামিয়ে দিয়ে সুদীপা প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল, 'প্লীজ স্টপ—'

'কেয়া অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'কী হল সুদীপা?'

'আমার সম্পর্কে কোন অ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্ট খোঁজ খবর রাখুক, এটা আমি একেবারেই চাই না।'

কেয়া চমকে উঠেছিল, 'কী বলছিস সুদীপা, দাদা অ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্ট!'

সুদীপা বলেছিল, 'আমি একাই বলছি না। সবাই বলে। একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবি।'

'প্লীজ সুদীপা, দাদার কথা যদি সব শুনিস—'

'শুনবার দারকার নেই। এরকম বাজে টাইপের ছেলেদের আমি ঘৃণা করি। আই হেট—' বলে আর দাঁড়ায় নি সুদীপা। প্রায় ছুটতে ছুটতেই নিজেদের বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল।

এর পর ক'দিন কেয়া ভীষণ গম্ভীর আর চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। কলেজে যাবার সময় বাস-স্টপে তার সঙ্গে দেখা হত না। অনেক আগে আগেই সে বেরিয়ে পড়ত। ক্লাসে এমনভাবে বসে থাকত, যেন সুদীপাকে দেখতেই পায় নি। ছুটির পরও একসঙ্গে আসত না। ইচ্ছে করেই লাইব্রেরিতে গিয়ে বইয়ের ওপর ঝুঁকে থাকত, কিংবা অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প-টল্প করে দেরি করত। সুদীপা চলে যাবার পর সে বাড়ি ফিরত।

খুব খারাপ লাগছিল সুদীপার। বাঝতে পারছিল, সেদিন ওভাবে রণবীর সম্পর্কে বলাটা ঠিক হয় নি। রণবীর যে টাইপের ছেলে হোক, তাকে কখনও রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বিরক্ত করে নি বা পেছন থেকে বাজে নোংরা কমেন্টও ছুঁড়ে দেয় নি। তা ছাড়া সে কেয়ার দাদা। ভাই সম্পর্কে কেউ খারাপ কিছু বললে তার দুঃখ পাওয়ারই কথা।

দিন সাতেক বাদে সুদীপা নিজের থেকেই সব মিটিয়ে নিয়েছিল। একটা অফ-পিরিয়ডে কেয়া যখন একা কলেজ লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছে, ছুটে গিয়ে সে তার হাত ধরেছিল। ভারী গলায় বলেছিল, 'আই অ্যাম স্যরি কেয়া। সেদিনকার কথা তুই মনে রাখিস না।'

কেয়া উত্তর দেয় নি, ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

সুদীপা আবার বলেছিল, 'তুই আমাকে অ্যাভয়েড করছিস, আমার সঙ্গে কথা বলিস না। এ ক'টা দিন আমার কী বিশ্রী যে লেগেছিল, বলে বোঝাতে পারব না।'

কেয়া চুপ।

সুদীপা বলেই যাচ্ছিল, 'তোর দাদার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না কিন্তু অনেকের কাছে শুনে শুনে একটা খারাপ ধারণা হয়ে গিয়েছিল। এক ধরনের কমপ্লেক্সও।'

কেয়া এবার বলেছিল, 'শুধু শুনে শুনে কারো সম্বন্ধে ধারণা করা ঠিক না।'

'নিশ্চয়ই। এখন বল, আমার ওপর আর রাগ করে থাকবি না। বল, বল—' কেয়ার হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করেছিল সুদীপা।'

কেয়া ভারি সরল মেয়ে। রাগ দুঃখ অভিমান—কোনো কিছুই পুষে রাখতে জানে না। সে হেসে ফেলেছিল, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। তবে—'

'কী?'

'দাদার সম্বন্ধে তোকে সব শুনতেই হবে। না হলে তোর সেই ধারণাটা থেকেই যাবে।'

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বলেছিল, 'আচ্ছা শুনব।'

কেয়ার সঙ্গে সন্ধি হবার পর মাঝে-মধ্যে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় ওদের বাড়ি যেত সুদীপা। কোনো কোনো দিন কেয়াকেও নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসত। ঠাকুমার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়েছিল। হেমনলিনী ওকে খুব পছন্দ করতেন। তবে বাবার সঙ্গে ওর আলাপ করানো হয় নি। কেননা, তিনি তখন 'নবজীবন হাউসিং'-এর অফিসে থাকতেন।

যাতায়াতের ফলে কেয়াদের সব খবরই জেনে ফেলেছিল সুদীপা। সব মিলিয়ে ওরা চারজন। কেয়া, রণবীর, ওদের মা এবং বাবা।

কেয়ার বাবা প্রিয়নাথ মুখার্জী ছিলেন মার্চেন্ট অফিসের কেরানি। দু' একদিন তাঁকে দেখেছেনও সুদীপা। কোলকুঁজো-মার্কা চেহারা, বাঁকানো পিঠ, ঘোলাটে চোখে বাইফোকাল লেন্সের গোল চশমা। একদিকে নিকেলের ডাঁটি ভেঙে গিয়েছিল, সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সেটা জুড়ে নিয়েছিলেন প্রিয়নাথ। পরনে মোটা ধুতি, সস্তা লংক্লথের পাঞ্জাবি, জুতোতে বেশ ক'টা তালি।

সাড়ে আটটায় বেরিয়ে যেতেন প্রিয়নাথ, ফিরতেন রাতে দু'টোয়। অফিসের পর এক মারোয়াড়ির গদিতে গিয়ে খাতা লিখতেন। দু'জায়গায় কাজ করেও সংসার চালাতে তাঁর জিভ বেরিয়ে যেত। বাড়িভাড়া, চারটে মানুষের খাওয়া-পরা এবং ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ—এসব টানতে তাঁর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে আসছিল।

রিটায়ারমেন্টের খুব বেশি দেরি ছিল না। তারপর কী করে চলবে, ভাবতেই প্রিয়নাথের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সারাক্ষণ যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে

থাকতেন। তাঁর দিকে তাকালে একটা সন্ত্রস্ত ভারবাহী পশুর কথা মনে পড়ে যেত।

অথচ ছেলেমেয়েকে ঘিরে তাঁর উচ্চাশা ছিল। টিফিন খেতেন না। খানিকটা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে, খানিকটা হেঁটে অফিসে যেতেন। এভাবে পয়সা বাঁচিয়ে ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুলে, ভলো কলেজে পড়াতে চেষ্টা করেছেন। কেয়ার দিক থেকে তাঁর আক্ষেপ নেই। কিন্তু রণবীর সম্পর্কে তাঁর প্রচুর দুঃখ। ইচ্ছা ছিল, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি-টিগ্রি নিয়ে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে ছেলে তাঁর পেছনে দাঁড়াক। তা হলে শেষ বয়সে তিনি একটু আরাম পান। কিন্তু প্রিয়নাথ যা ভেবেছিলেন, ঘটল তার উল্টো।

রণবীর সম্পর্কে কেয়া আর তার মায়ের কাছে টুকরো টুকরো ভাবে সুদীপা যা শুনেছে তা এইরকম।

রণবীর পড়াশোনায় দারুণ ভাল। শুধু তাই না, খেলাধুলো, গানবাজনা, ব্যবহার, ভদ্রতা—সব দিক থেকেই সে ছিল ব্রিলিয়ান্ট। স্পোর্টস আর মিউজিকে প্রচুর কাপ মেডেল আর ট্রফি পেয়েছে। কেয়া সেসব তাকে দেখিয়েও ছিল।

হ্যায়ার সেকেণ্ডারীতে এইটি-টু পারসেন্ট মার্কস পেয়ে ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিল রণবীর। কিন্তু সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেই পার্টিতে ঢুকল সে। চোখের সামনে তখন তার আইডিয়ালিজমের স্বপ্ন। পড়াশোনার দিকে আর নজর রইল না। দিনরাত হয় পোস্টার লিখছে, নয়তো মিছিল বার করছে কিংবা স্ট্রীট কর্ণার মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছে। এসব করতে করতে থার্ড ইয়ারে আর ওঠা হল না। কিন্তু তীব্র নেশার মতো রাজনীতি তখন তার রক্তের ভেতরে ঢুকে গেছে। সে বুঝতে পারছিল, ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ভালো রেজাল্ট করতে হলে লেখাপড়ায় যে সময় দিতে হবে সেটা তার হাতে নেই। পলিটিক্স আর পার্টি তার সব কিছু তখন ছিনিয়ে নিয়েছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে বি.এস.সি-তে ভর্তি হয়েছিল রণবীর। এ নিয়ে প্রিয়নাথ খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এটা তুই কী করলি খোকন?'

রণবীর বলেছিল, 'ভেবে দেখলাম ইঞ্জিনীয়ার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

ভয়ে ভয়ে প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'একটা কথা বলব?'

'কী?'

'লেখাপড়াটা কমপ্লীট করে পার্টি-টার্টি করলে ভালো হত না?'

তুমি যেভাবে বলছ, সেভাবে হয় না বাবা।'

'দ্যাখ, যা ভালো বুঝিস।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বি.এস. সিটাও পাশ করা হল না। যত দিন যাচ্ছিল, নেতাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে সে বুঝতে পারছিল ক্ষমতা দখলই আসল কথা। এম. এল. এ, এম. পি. বা মিনিস্টার হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। দেশ বা মানুষ তার পরে। স্বপ্নভঙ্গ যখন হল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার রণবীর বাড়ির দিকে নজর দিল। এতদিন লক্ষ্য করে নি, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, বাবার শরীরটা সংসার টেনে টেনে বেঁকে দুমড়ে গেছে। তাঁর দিকে আর তাকানো যায় না। সে ঠিক করে ফেলল, যে ভাবেই হোক একটা চাকরি-টাকরি তাকে যোগাড় করতেই হবে। অনেকটা সময় বেরিয়ে গেছে। এখন গ্র্যাজুয়েট-ফ্রাজুয়েট হতে গেলে চাকরি পাবার বয়স পার হয়ে যাবে। বাবাকে খানিকটা রিলিফ দেওয়া দরকার। রণবীর অফিসে অফিসে ঘুরতে লাগল, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে গাদা গাদা অ্যাপ্লিকেশন ছাড়তে লাগল, কিন্তু বেশির ভাগ জায়গা থেকেই প্রাপ্তি-স্বীকারটুকুও আসে না। দু'একটা ইন্টারভিউ যাও এল, তাতে কিছুই হল না। বোঝা গেল, গোটা ব্যাপারটাই একটা শো। আগে থেকেই বিশেষ বিশেষ ক্যাণ্ডিডেটের জন্য ভেতরে ভেতরে সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। বার বার সে খারিজ হয়ে যেতে লাগল।

অনবরত ধাক্কা খেতে খেতে একেবারেই সিনিক হয়ে গেল রণবীর। জীবন সম্পর্কে পেসিমিস্ট হতে হতে সে বুঝতে পারছিল, তার সামনে কোনো আশা নেই, ভবিষ্যৎ পুরোপুরি ঝাপসা।

যে মানুষের কোনো কাজ নেই, সম্পূর্ণ বেকার যে, তার হাতে আর কিছু না থাক, অফুরন্ত সময় থাকে। পেসিমিস্ট রণবীর সময় কাটাবার জন্য বাড়ির রোয়াকে বা সামনের চায়ের দোকানে বসতে লাগল। পশ্চিম বাঙলায় সে একাই বেকার নয়। সরকারি স্ট্যাটিসটিক্সে যে কয়েক লাখ বেকারের উল্লেখ আছে, তাদের কেউ কেউ এ পাড়াতেই থাকে। আস্তে আস্তে তারাও এসে রণবীরের চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল।

অকুপেশন আর রোজগার না থাকলে যা হয়, রণবীরেরা মাঝে মাঝেই হল্লা করতে শুরু করল, মারদাঙ্গা বাধাতে লাগল। সাউথ ক্যালকাটায় এই অভিজাত এলাকায় সবাই তাদের গায়ে অদৃশ্য স্ট্যাম্প মেরে দিল—অ্যান্টি-সোসাল।

যত শুনেছে ততই এক ধরনের সহানুভূতি বোধ করেছে সুদীপা। মনে হয়েছে, কারো সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা করার আগে তার সব কিছু জানা দরকার। আগের অস্বস্তি কেটে যেতে শুরু করেছিল সুদীপার।

যাই হোক, প্রথম থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে সুদীপা। কতবারই

তো সে কেয়াদের বাড়ি গেছে, রণবীরের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাও হয়েছে, কিন্তু আগের মতোই নিজে থেকে সে কখনও কথা বলে নি। তবে তার সম্বন্ধে সুদীপা এই প্রথম কিছুটা কৌতূহল বোধ করেছিল। এক ধরনের দুর্বোধ্য আকর্ষণও।

তারপর কবে যেন একদিন সুদীপাই রণবীরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল।

সে বলেছিল, 'এভাবে নিজেকে নষ্ট করছেন কেন?' ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল কিনা, মনে পড়ে না। তবে এরকমই কিছু বলে থাকবে।

রণবীর চমকে উঠেছিল। সুদীপা যে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে, এটা সে ভাবতে পারে নি। বলেছিল, 'স্ট্রেঞ্জ!'

'মানে?'

'আমার মতো একটা অ্যান্টি-সোসাল সম্পর্কে আপনার এত দুশ্চিন্তা কেন?'

সেদিন তার সম্বন্ধে সুদীপা কেয়াকে যা বলেছিল, নিশ্চয়ই রণবীর তা জেনে ফেলেছে। একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল সুদীপা। তবে সে দারুণ স্মার্ট ঝকঝকে মেয়ে। খুব স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, 'আপনি হয়ত কেয়ার কাছে কিছু শুনে থাকবেন। আপনার সম্বন্ধে না জেনেই কমেন্ট করেছিলাম। আই অ্যাম স্যরি।'

রণবীর বলেছিল, 'লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমি যা, তা-ই তো আমাকে বলেছেন।'

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বলেছিল, 'ওসব কথা মনে করে রাখবেন না।'

সত্যিকার স্পোর্টসম্যানের মতো ভঙ্গি করে রণবীর বলেছিল, 'ও কে, রাখব না।' বলে অল্প হেসেছিল।

'আমার কথার উত্তরটা কিন্তু এখনও পাই নি।'

'ও, নিজেকে নষ্ট করছি কেন—তাই তো?'

আস্তে মাথা নেড়েছিল সুদীপা।

রণবীর হেসে হেসে বলেছিল, 'নষ্ট করা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো অলটারনেটিভ নেই। লস্ট জেনারেশন বলে একটা কথা আছে—শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'আমি তাদেরই একজন।'

'কী বলছেন!'

'ঠিকই বলছি। কখনও কখনও সত্যি কথা শুনতে ভীষণ খারাপ

লাগে—তা না? ট্রুথ ইজ ভেরি রুড।'

সুদীপা এবার বলেছিল, 'কেয়ার কাছে শুনেছি, ভীষণ ভালো রেজাল্ট করেছিলেন হায়ার সেকেণ্ডারিতে। নতুন করে পড়াশোনাটা শুরু করে দিন না?'

চোখ কুঁচকে অদ্ভুত হেসেছিল রণবীর, 'কী হবে তাতে?'

'মানুষ পড়াশোনা করে কেন?'

'ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি-ফিগ্রি বাগিয়ে চাকরি জোটাবার জন্যে। তবে—'

'তবে কি?'

'এদেশে যা সিস্টেম তাতে আমাদের মতো ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের চাকরি হয় না।'

'আপনি একেবারে পেসিমিস্ট হয়ে গেছেন।'

কেয়া কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলেছে, 'বাবা, মা, আমি কত বুঝিয়েছি কিন্তু কারো কথাই শোনে না। সেই যে ওর মাথায় ঢুকেছে, কিছু হবে না—সেটা আর বার করা যাচ্ছে না।'

বোনের 'না'কে আলতো করে একটা টুসকি মেরে রণবীর বলেছিল, 'সেটা কোনদিনই বেরুবে না।'

সেদিন আর কিছু বলে নি সুদীপা। কিন্তু এর পর থেকে প্রায়ই কলেজ ছুটির পর নিজের অজান্তেই যেন কেয়াদের বাড়ি আসতে লাগল সুদীপা। এলেই যে রণবীরের সঙ্গে দেখা হত তা নয়। তবে দেখলেই পড়াশোনার কথা বলত, নতুন করে জীবন শুরু করার কথা বলত।

রণবীর হাসত, মজা করে বলত, 'আপনি একেবারে সোসাল রির্ফমারের মতো আমার পেছনে লেগেছেন দেখছি।'

সুদীপা বলত, 'শুরু করে দেখুন না। এই সিস্টেমের মধ্যেই কিছু একটা হয়ে যাবে।'

রণবীর উত্তর দিত না।

মনে পড়ে, সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিল। দিন কয়েক কলেজে যেতে পারে নি। একটু সুস্থ হয়ে বিকেলের দিকে কেয়াদের বাড়ি গিয়েছিল সুদীপা। ইচ্ছে ছিল এর মধ্যে প্রফেসররা যে ক্লাসনোট দিয়েছেন সেগুলো টুকে আনা।

কিন্তু গিয়ে দেখা গেল, কেয়া তখনও কলেজ থেকে ফেরে নি। কেয়ার মা তাকে মেয়ের ঘরে বসিয়ে কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে বলেছিলেন, 'কেয়া এখনই এসে পড়বে। তুমি একটু একলা থাকো। আমি হাতের কাজটা সেরে আসি।

কেয়ার মা চলে গেলে সামনের টেবিল থেকে একটা পুরনো ম্যাগাজিন তুলে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুদীপা। হঠাৎ টুং-টাং শব্দে মুখ তুলে চাইল। গীটারের বাজনা। মাঝে মাঝে থামছে। আবার বেজে উঠছে।

প্রথমে মনে হয়েছিল, কাছেই কোথাও রেডিও চলছে। কিন্তু রেডিও প্রোগ্রাম তো এভাবে থেমে থেমে হয় না। নিশ্চয়ই কেউ বাজাচ্ছে। কে হতে পারে? কেয়ার মা অবশ্যই না। বাড়িতে আর কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

আস্তে আস্তে উঠে পড়ছিল সুদীপা। বাইরে আসতেই মনে হল, কোণাকুনি বাঁ দিকের ঘরটা থেকে শব্দটা আসছে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে আসতেই চোখে পড়ল, তক্তপোশের ময়লা বিছানায় পা ঝুলিয়ে গীটার বাজাচ্ছে রণবীর।

অনেকদিন এ বাড়িতে এসেছে সুদীপা। কেয়ার ঘর ছাড়া আর কোথাও যায় নি। এটা যে রণবীরের ঘর, সে জানত না।

কেয়া যখন নেই, তার মা যখন অন্যদিকে কাজকর্মে ব্যস্ত, সেই সময় প্রায় ফাঁকা বাড়িতে রণবীরের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই খারাপ দেখায়। সুদীপা যখন কেয়ার ঘরে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতে যাবে, তক্ষুনি বাজনাটা থেমে গেল। অবাক বিস্ময়ে রণবীর বলল, 'আপনি?'

ফিরে যাওয়া হল না। সুদীপা বলেছিল, 'কেয়ার কাছে এসেছিলাম।'

'ও তো এখনও কলেজ থেকে ফেরে নি।'

'জানি, মাসীমা বলেছেন। বলে কিছুক্ষণ থেমে সুদীপা আবার শুরু করেছে কেয়ার ঘরে বসেছিলাম। বাজনা শুনে বেরিয়ে এলাম। আপনি বাজাচ্ছিলেন বুঝতে পারি নি।'

'বুঝলে নিশ্চয়ই এখানে আসতেন না।'

রণবীর বলেছিল, 'একজন সমাজবিরোধীর হাতে বাদ্যযন্ত্র দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন।'

সমাজবিরোধী বা অ্যান্টি-সোসাল শব্দটা একেবারে মাথায় বসে গিয়েছিল রণবীরের। কিছুতেই সেটা ভুলতে পারছিল না সে। রণবীরের কথার উত্তর না দিয়ে সুদীপা বলেছিল, 'আপনি তো ফাইন বাজান।'

'কম বয়সে যখন একটু-আধটু স্বপ্ন দেখতাম, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্লাইট আশা-টাশা ছিল তখন গীটারটা শিখেছিলাম। যাক গে, একটা অনুরোধ করব?'

'কী?'

'বাইরে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। যদি গা ঘিনঘিন না করে আর ভয় না পান, ঘরে এসে বসুন। প্লীজ—'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করেছিল সুদীপা। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবেই ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

রণবীরের ঘরটা কেয়ার ঘরের একেবারে উল্টো। যেমন অগোছালো তেমনি নোংরা। তেলচিটে বালিশ ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। বিছানায় এক ইঞ্চি পুরু ধুলো। এখানে ওখানে দড়িতে আধময়লা পাজামা, আর শার্ট-ফাট ঝুলছে। একটা সস্তা টেবিলের ওপর ছেঁড়াখোড়া কিছু রাজনীতির বই, প্যামফ্লেট। পাশেই হাতল-ভাঙা চেয়ার। একটা ভাঙা আলমারিতে প্রচুর কাপ, মেডেল, শীল্ড-টীল্ড ডাঁই করা হয়েছে। কেয়া বলেছিল, তার দাদা ভালো স্পোর্টসম্যান ছিল এককালে। কাপটাপগুলো সেই পুরনো দিনের স্মৃতিচিহ্ন। মেমোরি অফ দা গোল্ডেন পাস্ট।

রণবীর বলেছিল, 'ঘরে তো ইনভাইট করে আনলাম। কোথায় যে আপনাকে বসাই—'

তার কথা শেষ হবার আগেই ভাঙা চেয়ারে বসে পড়েছিল সুদীপা। বলেছিল, 'আপনি ভীষণ কমপ্লেক্সে ভোগেন।'

'হয়তো। ঠিক বুঝতে পারি না।' বলে গীটারটা একটা পুরনো খাপের ভেতর পুরতে লাগল রণবীর।

'আমি এসে আপনাকে বোধহয় ডিসটার্ব করলাম।'

'কি রকম?'

'বাজাচ্ছিলেন। আমি আসতে বন্ধ হল।'

'আরে না না, গীটারটা ঝেড়ে দেবার জন্যে বাইরে এনেছিলাম। খাপটা খুলে ভাবলাম, শেষবারের মতো একটু বাজিয়ে নিই।'

'ঝেড়ে দেবেন মানে!' বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল সুদীপা। কথাটার অর্থ সে বুঝতে পারে নি।

রণবীর হেসে ফেলেছে, 'ওটা আমাদের মতো অ্যান্টি-সোসালদের ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে বেচে দেব।'

'বেচবেন কেন?'

দুই আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে রণবীর বলেছিল, 'পকেটে ক্যাশ নেই। সিগারেট-ফিগারেট কেনা যাচ্ছে না।'

'সিগারেট খাবার জন্যে গীটারটা বেচে দেবেন!'

'শুধু কি সিগারেট, আরো অনেক কিছু খাব। কী খাব তা অবশ্য আপনাকে বলা যাবে না। আপনি আরো 'হেট' করবেন।

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে রণবীরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রণবীর এবার একটু থতিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে, তাই না? ও কে, আপনার অনারে বেচব না। তবে ওটার কোন ইউটিলিটি নেই। জঞ্জালের মতো ঘরে পড়ে আছে।'

সুদীপা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে কেয়ার গলা শোনা গিয়েছিল। রণবীর বলে উঠেছিল, 'আপনার ফ্রেণ্ড কলেজ থেকে এসে গেছে। যান—'

একটা ছেলে—যার কেরিয়ার ব্রিলিয়াণ্ট হতে পারত, একটু একটু করে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না সুদীপা। দেখা হলেই সে রণবীরকে বলত, 'ক্রিমিন্যাল ছাড়া নিজের এত এনার্জি আর কোয়ালিটি কেউ নষ্ট করে না।'

রণবীর রাগ করত না, হাসত।

সুদীপা ক্ষেপে উঠত, 'ডোন্ট লাফ। একটা কথা ভেবে দেখেছেন?'

'কী?'

'আমাদের দেশের মানুষের অ্যাভারেজ লঞ্জিভিটি পঁয়ষট্টি বছর। আপনার বয়স কত?'

'বাকি একচল্লিশ বছর রোয়াকে আড্ডা দিয়ে স্ট্রীট রাফায়েনদের মতো কাটিয়ে দিতে পারবেন?'

রণবীর চমকে উঠেছিল। কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় নি।

এর কয়েকদিন বাদে কলেজ ছুটির পর বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে ছিল সুদীপা। আজ সে একাই এসেছে। বাড়ির কী একটা দরকারী কাজে কেয়া কলেজে আসতে পারে নি।

বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সুদীপার চোখে পড়েছিল, খানিকটা দূরে যে পার্কটা রয়েছে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে রণবীর। সুদীপার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। রণবীর কি তার জন্যই কলেজ পর্যন্ত চলে এসেছে। নানারকম দুর্নাম শোনা সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের শ্রদ্ধাই ছিল সুদীপার। অত্যন্ত এতদিন পর্যন্ত সে এমন কোনো আচরণ করে নি যা অশোভন। লুব্ধ নোংরা চোখে কখনও সে তার দিকে তাকায় নি। কিন্তু কলেজের কাছে রণবীরকে দেখে ভীষণ খারাপ লেগেছিল। রাগে এবং উত্তেজনায় সুদীপার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। রাগে এবং

উত্তেজনায় সুদীপার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে লম্বা লম্বা পা ফেলে রণবীরের কাছে চলে গেছে সে। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'এর মানে কী?'

খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই রণবীর বলেছে, 'কীসের?'

'যদি সৎ সাহস থাকে, একটা কথার উত্তর দিন।'

'কী কথা?'

'আপনি এখানে কী জন্যে এসেছেন?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে।' বলে নিষ্পাপ হেসেছিল রণবীর।

এই উত্তরটা আশা করে নি সুদীপা। ভেবেছিল, রণবীর ঘাবড়ে গিয়ে আজেবাজে কিছু একটা বলবে। এখানে আসার মিথ্যা অজুহাত দেখাবে। তা ছাড়া এই প্রথম সে তাকে 'তুমি' বলেছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুদীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

'একটা খবর দিতে। কেয়ার সামনে বলতে পারতাম না। ও আজ কলেজে আসেনি বলে চান্সটা নিয়েছি। এক ঘণ্টার মতো ঐ পার্কটায় বসে ছিলাম। তোমাকে দেখে বেরিয়ে এলাম।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য করতে করতে সুদীপা বলেছিল, 'কী খবর?'

'অনেক ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক। বাকি লাইফটা হল্লা করে, রোয়াকে আড্ডা দিয়ে, বাবার ধর্মশালায় ফ্রী-তে খেয়ে কাটানো যাবে না। এবার পজিটিভ কিছু করব।'

একটা ছেলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে যেতে তারই কথায় যে জীবনের নেগেটিভ দিক থেকে ফিরে আসতে চাইছে, এটা খুবই ভালো লেগেছিল সুদীপার। কিন্তু ভালো লাগাটা মুখেচোখে ফুটে উঠতে দেয় নি। স্থির চোখে শুধু একবার রণবীরের দিকে তাকিয়েছিল সুদীপা।

রণবীর আবার বলেছিল, 'ভাবছি দু'-একদিনের মধ্যে নাইট ক্লাসে অ্যাডমিশন নেব। সেই সঙ্গে নুতন করে চাকরি-টাকরির চেষ্টা করব। বাবার রিটায়ারমেন্টের বেশি দেরি নেই। ফ্যামিলির বার্ডেন টেনে টেনে শরীরটাও ভেঙে গেছে। বাবাকে হেল্প করতেই হবে।'

আধফোটা গলায় সুদীপা বলেছিল, 'এবার আমাকে যেতে হবে। ফিরতে দেরি হলে বাড়িতে ভাববে।'

রণবীর ব্যস্তভাবে বলেছিল, 'তোমাকে আর আটকাবো না। বাস স্টপে চল।'

সুদীপার ভয় ছিল, রণবীর হয়ত তার সঙ্গে ফিরবে। কিন্তু না, তাকে

বাসে তুলে দিয়ে সে নিচেই দাঁড়িয়ে ছিল।

রণবীর তার সঙ্গে একই বাসে ফিরুক, সুদীপা মনে মনে তা চায় নি। তবু ভদ্রতা দেখাতে সে বলেছিল, 'আপনি যাবেন না?'

সুদীপা তখনও ফুটবোর্ডে। রণবীর নিচু চাপা গলায় বলেছিল, 'আমার মতো হুলিগানের সঙ্গে তোমাকে বাস থেকে নামতে দেখলে পাড়ায় লোকেরা কিছু ভাবতে পারে। আমার জন্যে তোমার এতটুকু অসম্মান হয়, এ আমি চাই না।'

সুদীপা আর কিছু বলে নি। সেই মুহূর্তে রণবীর সম্পর্কে এক ধরনের শ্রদ্ধাই হয়েছিল তার।

এর পর থেকে মাঝে-মধ্যে কেয়াকে লুকিয়ে কলেজের সামনের সেই পার্কটায় সুদীপার সঙ্গে দেখা করত রণবীর। কবে আসবে, সেটা অবশ্য আগেই জানিয়ে দিত। এ ছাড়া কলেজ ছুটির পর প্রায় রোজই সে কেয়াদের বাড়ি যেত এবং অবধারিত নিয়মে রণবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।

এর মধ্যে নাইট ক্লাসে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল রণবীর। চাকরির জন্য নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে শুরু করেছিল। বাড়ির সামনের রোয়াকে, চায়ের দোকানে বা রাস্তায় তখন তাকে দেখা যেত না।

সুদীপাকে আলাদা পেয়ে রণবীর বলত, 'আমি অনেক চেঞ্জ করে গেছি, তাই না?'

সুদীপা বলত, 'লোকে তাই বলছে। একেবারে গুড বয়।'

'কে কী বলছে, আই-ডোন্ট কেয়ার। তুমি কী বলছ!'

'দেখি আর কিছুদিন।'

ছেলেমানুষের মতো জোরজার করত রণবীর, 'প্লীজ, বলো না—'

সুদীপা হেসে ফেলত। বলত, 'বদলে গেছ, বদলে গেছ, বদলে গেছ। হলো তো?' কবে থেকে রণবীরকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিল, এতকাল বাদে আর মনেও পড়ে না তার।

গভীর গলায় রণবীর বলত, 'এ সবই তোমার জন্যে। তোমার হাতে আমার রি-বার্থ হচ্ছে।'

সুদীপা চুপ করে থাকত।

খানিকটা ঝুঁকে রণবীর বলতে থাকত, 'তুমি আমার গড। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি ফিনিশড হয়ে যেতাম।'

সুদীপা এবার বলত, 'কী যে বল!'

একটি যুবককে ভেঙেচুরে নিজের ইচ্ছামতো আকার দিতে কি যে সুখ

আর উত্তেজনা তা বোঝানো যায় না। সেই সময়টা আশ্চর্য এক নেশার ঘোরে যেন কেটে যেত সুদীপার।

তার সঙ্গে রণবীরের কতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, পুরোটা না জানলেও কেয়া কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারত। প্রায়ই বলত, 'তুই ভাই ম্যাজিক জানিস। তোর জন্যে দাদাটাকে আমরা ফিরে পাচ্ছি। মা বাবা রোজই বলে, তোর ঋণ শোধ করতে পারবে না।' বলতে বলতে তার গলায় কৃতজ্ঞতার সুর ফুটে উঠত।

এইভাবেই বলছিল। আচমকা একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতেই সুদীপা দেখে, দোতলার ব্যালকনিতে উমাপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছেন। এ সময়টা কোনদিনই বাবা বাড়ি থাকেন না। সুদীপা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবে কি বাবার শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে?

ওপর থেকে উমাপ্রসাদ ভীষণ গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'দোতলায় ঠাকুমার ঘরে এসে।'

বাবার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠেছিল সুদীপা। এক পলক তাঁর দিকে তাকিয়ে এবং তক্ষুনি মুখ নামিয়ে লন আর গার্ডেনের মধ্যবর্তী নুড়ির রাস্তাটা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভেতর চলে গিয়েছিল।

তখন দোতলার একদিকে থাকতেন উমাপ্রসাদ, আরেক দিকে হেমনলিনী। আর এখনকার মতো তেতলাতেই থাকত সুদীপা।

ঠাকুমার ঘরে যেতেই চোখে পড়েছিল, থমথমে মুখ করে বসে আছেন উমাপ্রসাদ। হেমনলিনী এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখও গম্ভীর, তবে সেখানে কিছুটা উদ্বেগও ফুটে উঠেছে।

বাবা বলেছিলেন, 'ওখানে বোসো—' বলে আঙুল বাড়িয়ে হেমনলিনীর খাটটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

ভয়ে ভয়ে বসে পড়েছে সুদীপা।

হেমনলিনী ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'অরে (ওকে) বেশি বকাবকি করিস না নান্টু। বুঝাইয়া ক'।

মেয়ের দিকে চোখ রেখেই বিরক্ত গলায় উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'মা, তুমি চুপ কর।' তারপর সুদীপাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি ভেবেছ? যথেষ্ট সাবালিকা হয়ে উঠেছ!'

খুব ছেলেবেলায় মা মরে গিয়েছিল বলে বাবা কখনও তাকে বকতেন না, গায়ে হাত তুলতেন না। বাবার কাছ থেকে এতকাল সে যা পেয়ে এসেছিল তা হল গাঢ় মমতা, অঢেল স্নেহ এবং আদর। কিন্তু সেদিন তাঁর চেহারা

একেবারে অন্যরকম। সুদীপার বুকের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করেছিল। টের পাচ্ছিল, ঘামে জামা ভিজে যাচ্ছে।

বাবা এবার বলেছিলেন, 'তোমাকে খানিকটা স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। একা একা স্কুল-কলেজে যেতে দিতাম। সেই ফ্রীডমটা এইভাবে মিসইউজ করলে?'

উমাপ্রসাদ কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে কাঁপা গলায় সুদীপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কীসের স্বাধীনতা? কীসের মিসইউজ?'

'বুঝতে পারছ না?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিল সুদীপা অর্থাৎ পারছি না।

উমাপ্রসাদ চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'হু ইজ দ্যাট বাস্টার্ড? কে সে? তার কণ্ঠস্বর বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছিল যেন।

বাবার প্রচণ্ড রাগ এবং উত্তেজনার কারণ কী, এতক্ষণে খানিকটা ধরতে পেরেছিল সুদীপা। তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত যেন ছুটে যাচ্ছিল। শ্বাসরুদ্ধের মতো সে বলেছে, 'কার কথা বলছ তুমি?'

'সেটা তোমার ভালো করেই জানা আছে।'

সুদীপা চুপ।

উমাপ্রসাদ আবার বলেছিলেন, 'ক'দিন ধরেই আমার কাছে রিপোর্ট আসছে, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কলেজের সামনের পার্কে একটা ছোকরার সঙ্গে তুমি প্রায়ই আড্ডা দিচ্ছ।'

সুদীপা বলেছিল, 'আমি একদিনও ক্লাস ফাঁকি দিই নি। তুমি কলেজে খোঁজ নিতে পার।'

উমাপ্রসাদ একটুও দমে যান নি। বলেছেন, 'খোঁজ নেবার দরকার নেই। সেটা তোমার বা আমার পক্ষে সম্মানজনক নয়। ক্লাস ফাঁকি না দিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই অফ-পীরিয়ডে গেছ।'

সুদীপা উত্তর দেয় নি।

উমাপ্রসাদ গমগমে ভয়ঙ্কর গলায় জিজ্ঞেস করেছেন, 'এখন বল ছোকরাটা কে? কী নাম?'

সুদীপা বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে নি। মুখ নামিয়ে বলেছে, 'রণবীর—আমার এক বন্ধুর দাদা।'

'কোথায় থাকে?'

রণবীরদের রাস্তার নাম জানিয়েছিল সুদীপা।

সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, শরীরের সব রক্ত দ্রুত উমাপ্রসাদের মুখে উঠে আসছে। তীব্র চাপা গলায় বলেছিলেন, 'ঐ

রাসকেল অ্যান্টি-সোসালটা!’

ঠাকুমা পাশ থেকে বলে উঠেছিলেন, ‘এইটা তুই কী করলি দিদি!’

উমাপ্রসাদ আবার বলেছিলেন, ‘ছি ছি, এ বাড়ির মেয়ে হয়ে তোমার এ রকম রুচি কী করে হল! এ আমি ভাবতেও পারি না।’ একটু থেমে বলেছিলেন, ‘আমার কাছে আরো রিপোর্ট আছে। ছুটির পর তুমি ঐ রাসকেলটার পাড়ায় একটা বস্তিতে যাও। নিশ্চয়ই সেটা ওদের বাড়ি।’

‘হ্যাঁ।’

স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছেন উমাপ্রসাদ। তারপর বলেছেন, ‘লোকের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কী করে যে তুমি ওরকম বাজে ছেলের পাল্লায় পড়লে! এত দিনের শিক্ষা, কালচার, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড—এ সব কি করে ভুলে গেলে! ছি-ছি—’

কোনো রকমে বুকের ভেতর একটু সাহস জড়ো করে সুদীপা বলেছিল, ‘বাবা, কেউ তোমাকে ভুল খবর দিয়েছে। রণবীর অ্যান্টি-সোসাল রাফায়েন না। চাকরি-ট্যাকরি না পেয়ে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে গিয়েছিল। তাই—’

‘স্টপ, স্টপ, স্টপ। একটা থার্ড ক্লাস ছোকরার হয়ে প্লীড করতে তোমার লজ্জা করছে না! এতই শেমলেস হয়ে গেছ!’

সুদীপা আর কিছু বলে নি।

উমাপ্রসাদ আবার বলেছেন, ‘এখন থেকে তুমি আর বাসে-ট্রামে কলেজে যাবে না।’

সুদীপা মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছে, ‘তা হলে কী ভাবে যাব?’

‘মহেশ্বর গাড়ি করে তোমাকে পৌঁছে দেবে, ছুটির পর নিয়ে আসবে।’

সুদীপা চুপ।

উমাপ্রসাদ থামেন নি, ‘এখন থেকে কলেজ ছাড়া একা বাইরে বেরুবে না। যদি কোথাও যেতে হয়, আমি নিয়ে যাব।’

ছেলেবেলা থেকে যে স্বাধীনতাটুকু তার ছিল, বাবার একটি কথায় তা নাকচ হয়ে গিয়েছিল। মহেশ্বর ছিল তাদের দু'জন ড্রাইভারের একজন। পরের দিন থেকে উমাপ্রসাদের হুকুম মতো সে কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

আগে টের পায় নি কিন্তু দু'চার দিন মহেশ্বরের সঙ্গে যাতায়াত করতে করতে সুদীপা বুঝতে পারল, কবে কখন যেন তার ভাবনার অনেকটা অংশ দখল করে নিয়েছে রণবীর। বাবা যা ব্যবস্থা করেছেন, তাতে ওদের বাড়ি যাওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ ওকে দেখতে ইচ্ছা করত। অফ-পিরিয়ডে

কলেজের সামনের পার্কটায় রণবীর এলে অবশ্য দেখা হত। কিন্তু ক'দিন ধরে আসছিল না। সারাক্ষণ বুকের ভেতর এক ধরনের চাপা কষ্ট হতে থাকত সুদীপার।

রণবীরদের বাড়ি যেতে না পারলেও কেয়ার সঙ্গে রোজই কলেজে দেখা হত। মাঝে মাঝে ভাবত, রণবীরের কথা জিজ্ঞেস করবে। সামনের পার্কে তাকে আসতে বলবে। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারত না। অদ্ভুত এক লজ্জা তাকে পেয়ে বসত।

এদিকে কেয়া কিন্তু ট্রাম-বাসের বদলে হঠাৎ গাড়িতে করে কলেজে আসা-যাওয়ার কারণটা জানতে চাইল। কোনদিন সুদীপা বলত, দেরি হওয়ার জন্য গাড়িতে এসেছে। কখনও বলত, শরীরটা খারাপ বলে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে আসতে কষ্ট হয়। তাই বাড়ির গাড়িতে আসা।

দু'জনের ছুটি একই সঙ্গে। ফেরার সময় ভারী মুশকিল হত সুদীপার। কেয়াকে নিয়ে ফিরলে মহেশ্বর উমাপ্রসাদকে জানিয়ে দেবে। তাই কোনদিন বলত, 'আজ বাবার অফিস হয়ে বাড়ি ফিরব। তুই চলে যা।' কোনদিন বলত, 'বড় মাসীর খুব অসুখ, তাঁকে দেখতে যাব' ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম প্রথম কেয়া বিশ্বাস করত। ভারি সরল ছিল মেয়েটা। তবে বলত, 'আমাদের বাড়ি অনেকদিন যাস না। মা তোর কথা খুব বলে—'

সুদীপা বলত, 'মাসীমাকে বলিস, যাব একদিন।' একটা না একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে সে এড়িয়ে যেত।

কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে কত আর মিথ্যে বলা যায়? শেষ পর্যন্ত একদিন ধরা পড়তেই হল। বিশাল কলেজ-কমপাউণ্ডের ভেতর অনেকটা জায়গা জুড়ে মেয়েদের আউটডোর গেমের মাঠ। একধারে অনেকগুলো ঝাঁকড়া-মাথা কৃষ্ণচূড়া গাছ গা ঘেঁসাঘেঁসি করে রয়েছে। অফ-পিরিয়ডে কেয়া তাকে সেখানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'একটা সত্যি কথা বলবি?'

সুদীপা চমকে উঠেছিল। কিছু একটা আন্দাজ করে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'কী?'

'তুই আমাদের অ্যাভয়েড করছিস কেন?'

'না-না, অ্যাভয়েড করব কেন? প্লীজ, শুধু শুধু মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড করিস না ভাই।'

কেয়া রুক্ষ গলায় বলেছিল, 'আমি দু'বছরের বাচ্চা নই যে, যা বলবি তাই মেনে নেব। আসলে—'

সুদীপা বলেছিল, 'আসলে কী?'

'আমরা গরিব, বস্তিতে থাকি—'

কেয়ার কথা শেষ, হতে না হতেই চেঁচিয়ে উঠেছিল সুদীপা, 'না-না, ওরকম কথঙ্গ বলিস না ভাই। ভীষণ কষ্ট পাব। তোর মতো বন্ধু আমার আর কেউ নেই। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকেছে কেয়া।

আর এড়ানো যায় নি। তা ছাড়া মিথ্যে বলে বলে সুদীপা নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হুড়হুড় করে এবার বাবার কথাগুলো বলে গিয়েছিল সে।

সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেছে কেয়া। তারপর বলেছে, 'তোর বাবা ঠিকই বলেছেন হয়ত। আমাদের কোন স্ট্যাটাস নেই, ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই। তোরা আমরা একেবারে আলাদা সোসাইটির মানুষ। আমাদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করলে কমপ্লিকেশনই হবে। কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল সুদীপা।

কেয়া বলেছিল, 'দাদাটাকে নিয়ে মুশকিল হল যে।'

'কী হয়েছে?'

'তোর কথা খুব জিজ্ঞেস করছিল। একদিন তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়। ' বলে একটু থেমে আবার শুরু করেছিল কেয়া, 'আমি দাদাকে বলেই দেব, তা আর হয় না। ইমপসিবল।'

হঠাৎ কী যেন হয়ে গিয়েছিল সুদীপার। বলেছিল, 'তোর দাদাকে কাল আসতে বলিস।'

'কিন্তু—'

গলার স্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে সুদীপা বলেছিল, 'আমি যা বললাম তাই করবি। কাল যেন ডেফিনিটলি তোর দাদা আসে।'

কেয়া খানিকটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, 'তোর বাবা জানতে পারলে—'

'সে আমি বুঝব।'

পরের দিন রণবীর এসেছিল ছুটির সময়। কলেজ-গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপা তার সঙ্গে সবে দুটো কি একটা কথা বলেছে, মহেশ্বর গাড়ি নিয়ে হাজির। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে সে রোজ চলে আসত।

মহেশ্বর অনেকদিন তাদের গাড়ি চালাচ্ছে। অত্যন্ত সৎ এবং বিশ্বাসী মহেশ। বাবা তার ওপর নানা ব্যাপারে নির্ভর করতেন। সেও ছিল তাদের খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী। কোনো কারণে সুদীপাদের পরিবারের মর্যাদা নষ্ট না হয়, সেদিকে ছিল তার তীক্ষ্ণ নজর। এই কারণেই সুদীপাকে কলেজে নিয়ে যাবার

এবং ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাকে দিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ।

স্থির চোখে একটুক্ষণ রণবীরকে দেখে মহেশ্বর গাড়ির পেছন দিকের দরজাটা খুলে দিয়েছে। খুব শান্ত গলায় বলেছে, 'উঠে এসো দিদি।' রণবীরকে সে চিনত। তার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করার জন্যই যে গাড়ি করে সুদীপাকে কলেজে পাঠানো হচ্ছে, উমাপ্রসাদ হয়তো তা মহেশ্বরকে জানিয়ে থাকবেন। মহেশ্বর বুঝতে পেরেছিল, এই ব্যাপারটার সঙ্গে উমাপ্রসাদের পারিবারিক সুনাম এবং সম্মান জড়িয়ে আছে।

সুদীপা বলেছিল, 'একটু দাঁড়াও মহেশ্বরদা।'

ঠাণ্ডা গলায় মহেশ্বর বলেছিল, 'বড়বাবুর অর্ডার নেই। উঠে এসো।'

তখন কলেজ থেকে আরো মেয়ে বেরিয়ে আসছে। সবাই তাদের লক্ষ্য করছিল। সুদীপা ওখানে কোনো নাটক করতে চায় নি। বিপন্ন মুখে রণবীরের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি কাল দুপুরে একবার এসো। সিওর আসবে। ' বলেই গাড়িতে উঠেছিল।

রণবীর বলেছিল, 'আসব।'

আর কিছু বলার সুযোগ পায় নি সুদীপা। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়াই ছিল, অ্যাকসিলেটারে চাপ দিতেই সেটা অ্যাসফাল্টের রাস্তা দিয়ে দারুণ স্পীডে ছুটতে শুরু করেছিল।

ইচ্ছা করেই সুদীপা মহেশ্বরকে শুনিয়ে রণবীরকে কাল আসার কথা বলেছিল। সে জানত, ব্যাপারটা উমাপ্রসাদের কানে উঠবেই। বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র মহেশ্বর জানিয়ে দেবে। জানাক। আসলে সুদীপার মধ্যে ভয়ের বদলে একটা জেদ যেন ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। নানাদিক থেকে ভেবে দেখেছে, সে বা রণবীর কোনো অন্যায় করে নি। আসলে বাবার মাথায় সোসাল স্ট্যাটাস, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড, ইত্যাদি শেকড় গেড়ে আছে। অনেকটা আজকের সংসারের মতো। অথচ চিন্তা করে দেখলে এমন কিছুই না। একটা ছেলেকে নেগেটিভ দিক থেকে ফিরিয়ে আনতে সে চেষ্টা করেছে। এর ভেতর আর কী থাকতে পারে! উমাপ্রসাদ যদি এ নিয়ে আবার কিছু বলেন, শিরদাঁড়া শক্ত করে সে মুখোমুখি দাঁড়াবে।

যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই। সেদিন রাত্তিরে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বাবা চিৎকার করে উঠেছিলেন, তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আবার সেই রাফারেনটার সঙ্গে মিশতে শুরু করেছ! নিশ্চয়ই তোমার কাছে প্রশ্রয় পাচ্ছে। নইলে তার এতখানি সাহস হয় কী করে?'

বুকের ভেতরটা কাঁপছিল ঠিকই। সোজা দাঁড়িয়ে থেকে সুদীপা বলেছিল,

'রণবীর রাফারেন না বাবা। তুমি ভীষণ ভুল করছ।'

দাঁতে দাঁত চেপে উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তুমি যে ধরনের কথা বলছ, সে সব ড্রামা-ট্রামায় শোনা যায়। লাইফ ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। তুমি যেভাবে চলেছ, সেটা বাবা হয়ে আমি এনকারেজ করব না।'

'বাবা—'

সুদীপা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই উমাপ্রসাদ চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'তুমি কি আমার এগেনস্টে রিভোল্ট করতে চাও?'

সুদীপা অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'কী বলছ তুমি বাবা!'

উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তা হলে চাও না! গুড। কিন্তু তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না।' একটু থেমে বলেছিলেন, 'তোমার ঠাকুমার বয়েস হয়েছে, তাঁর পক্ষে তোমাকে কনট্রোল করা সম্ভব না। আমার পক্ষেও তোমাকে আগলে বসে থাকা ইমপসিবল। তোমার মা বেঁচে থাকলে এই প্রবলেমটা হত না। এনিওয়ে, কাল থেকে তুমি কলেজে যাবে না।'

সুদীপা চমকে উঠেছিল, 'আমি আর পড়ব না?'

'নিশ্চয়ই পড়বে। কলেজেও যাবে। তবে ওই কলেজে আর নয়।'

'কোথায় তা হলে?'

'পরে জানতে পারবে।'

মনে আছে, এর পর দিন সাতেক বাড়িতেই কেটে গিয়েছিল। তেতলায় নিজের ঘরটা থেকে বেরুত না সুদীপা। জানালার ধারে চুপচাপ বসে থাকত। ঠাকুমা অবশ্য দু'এক ঘণ্টা পর-পরই এসে তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতেন, 'মন খারাপ করিস না দিদি। বাবায় যা করছে, সব তর ভালর লেইগা। বাপ-মায়ের থিকা বড় কেউ নাই।'

বাবাও কাজে বেরুবার আগে একবার এবং রাত্তিরে ফিরে আরেকবার ঘরে আসতেন। নরম গলায় বলতেন, 'আমার চাইতে বড় ওয়েল-উইশার তোর আর কেউ আছে? বল না মা, বল—'

সুদীপা কিছুই বলত না।

এর মধ্যে কেয়া কোত্থেকে যেন একবার ফোন করেছিল, 'কীরে কলেজে আসছিস না কেন? শরীর খারাপ হয়েছে?'

সুদীপা বলেছিল, 'না।'

'তা হলে?'

'ঐ কলেজে আমার আর পড়া হবে না।'

'কোন্ কলেজে পড়বি?'

'জানি না। এখন জেলখানায় আটকে আছি। বাবা পরে কী ডিসাইড করেন, দেখা যাক।'

একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ গলায় কেয়া বলেছিল, 'বিশ্রী লাগছে। কেন যে আমাদের সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছিল।'

মনে পড়ে, কলেজ বন্ধ হবার দশ দিন বাদে জানালার কাছে সে বসে ছিল। তখন সকাল আটটা-টাটটা বাজে। সূর্যটা আকাশের ঢালু গা বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে আসছে। অঢেল রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছিল। নিচে তাদের বাগানের গাছগুলোর মাথায় অনবরত পাখি ডাকছিল।

হঠাৎ সুদীপার চোখে পড়েছিল, সামনের রাস্তা দিয়ে রণবীর এদিকে আসছে। বিদ্যুৎচমকের মতো তার মাথার ভেতর দিয়ে কী যেন বয়ে গিয়েছিল।

কোথায় যাচ্ছে রণবীর? পলকহীন তাকিয়ে ছিল সুদীপা। এক সময় রাস্তার বাঁক ঘুরে রণবীর সোজা তাদের গেট খুলে বাড়ির কমপাউণ্ডে ঢুকে পড়েছিল। সেই মুহূর্তে সুদীপার মনে হয়েছিল নিঃশ্বাস পতন বন্ধ হয়ে গেছে।

নুড়ি রাস্তা মাড়িয়ে একটু পর সে পোর্টিকোর তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

বাবা তখন বাড়িতেই। রণবীরকে দেখামাত্র তাঁর রিঅ্যাকশন কী হতে পারে, ভাবতেই সুদীপার মাথার ভেতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো কিছু শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্তও সে আর বসে থাকে নি। ঘর থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে দুটো তিনটে করে সিঁড়ি পেরুতে পেরুতে নিচে নেমে এসেছিল।

একতলায় যে বিশাল ড্রইংরুমটা আছে, সেখানে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল সুদীপাকে। ভেতরে তখন বাবার গমগমে গলা শোনা যাচ্ছিল, 'আমার পারমিশান ছাড়া এ বাড়িতে তোমাকে কে ঢুকতে দিল?'

বোঝা যাচ্ছিল, সুদীপা ওপর থেকে নামার আগেই উমাপ্রসাদের সঙ্গে রণবীরের কিছু কথা হয়েছে। হয়ত নিজের পরিচয় সে এর মধ্যেই দিয়েছে।

রণবীর বলেছিল, 'কেউ না। গেট খুলে আমি নিজেই ঢুকেছি।'

দেয়ালের আড়াল থেকে দেখা না গেলেও সুদীপা বুঝতে পারছিল, বাবার শরীরের রক্তচাপ একটা বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি।'

'আপনাকে ভয় পাবার তো কারণ নেই। আমি চুরিও করি নি, মার্ডারও করি নি।'

‘কী চাও তুমি? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?’

‘তার আগে বালুন, সুদীপাকে ঘরে আটকে রেখেছেন কেন? শুনলাম কলেজে আর পাঠাবেন না। কেন?’

‘সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?’

‘না, আমি শুধু জানতে চাইছি।’

‘আমি জানাতে বাধ্য নই।’

‘বেশ জানাবেন না। তবে জানতে আমি পারবই।’

দেয়ালের পাশ থেকে খানিকটা সরে এসে মুখটা সামান্য বাড়িয়ে দরজায় উঁকি দিয়েছিল সুদীপা। বাবা একটা সোফায় বসে, সামনের সেন্টার টেবিলের ওপারে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল রণবীর। বাবার চোখমুখ উত্তেজনায় রাগে গনগনে আগুনের মতো মনে হচ্ছিল। রণবীরকে দেখা যাচ্ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল, সে খুবই শান্ত ধীর এবং উত্তেজনাশূন্য।

উমাপ্রসাদ এবার চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কী কর তুমি?’

রণবীর বলেছিল, ‘আপনি তা জানেন। আমার সম্বন্ধে সব ‘ডাটা’ই তো কালেক্ট করেছেন, তাই না?’

‘তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।’

‘ঠিক আছে। এতদিন কিছুই করছিলাম না। রোয়াকে আড্ডা মেরে, হল্লাবাজি করে টাইম কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, ওয়াগন-ব্রেকারদের দলে ভিড়ে যাব। নইলে চুল্লু স্মাগলিং করব।’

মনে হচ্ছিল, শুনতে শুনতে যে কোন মুহূর্তে উমাপ্রসাদের চোখ দুটো ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। নিজের অজান্তেই যেন তিনি বলে ফেলেছিলেন, ‘চুল্লু কী?’

‘চোলাই মাল। কান্ট্রি লিকার।’

‘তোমার বাবা কী করে?’

‘করে না, করেন বলুন। আমার বাবার সম্বন্ধে এমন ‘ভাষা’ শুনতে চাই না যাতে অশ্রদ্ধা আছে। ভদ্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার করুন।’

কর্কশ গলায় বিদ্রূপের ভঙ্গিতে উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, ‘অল রাইট, কী করেন?’

‘কেরানিগিরি।’

‘মাইনে?’

‘সাড়ে ছ’শো।’

‘যে বাড়িতে থাকো, সেটা তোমাদের?’

'না। ভাড়া বাড়ি। স্লান টাইপের।' বলে রণবীর জিজ্ঞেস করেছিল, 'অপোনেন্ট পার্টির উকিলদের মতো উল্টোপাল্টা জেরা করে কী জানতে চাইছেন?'

উমাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না। তুমি আমাদের বাড়িটা দেখেছ?'

'বাইরে থেকে যেটুকু চোখে পড়ে, দেখেছি।'

'এটার দাম দশ লাখ টাকা।'

'হতে পারে।'

'আমাদের ক'টা গাড়ি আছে জানো?'

'না।'

'তিনখানা। আমি বছরে কত টাকা ইনকাম-ট্যাক্স আর ওয়েলথ্ ট্যাক্স দিই, তোমার আইডিয়া আছে?'

'না, তার দরকার নেই। এক লাখ, দু' লাখ, বিশ লাখ, এক কোটি—যত ইচ্ছা আপনি দিন, সো হোয়াট? এসব শোনার মতো সময় বা ইন্টারেস্ট কোনোটাই আমার নেই।'

'আছে আছে, নিশ্চয়ই আছে।' বলতে বলতে হঠাৎ ফেটে পড়েছিলেন, 'এই বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের জন্যে একটা সরল ভালো মেয়েকে ট্র্যাপে ফেলবার চেষ্টা করছ। কিন্তু তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। একটা রাসকেল, স্ট্রীট ডগ, চালচুলো নেই, বাড়িঘর নেই। তোমার লোভ আর স্পর্ধা দেখে মাথা ঘুরে যায়!'

'কী আজেবাজে বলছেন?'

'আজে বাজে!'

'নিশ্চয়ই। আপনার বাড়ি, গাড়ি বা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সে পেচ্ছাব করার ইচ্ছেও আমার নেই।'

'শাট আপ স্কাউন্ড্রেল। এটা ভদ্রালোকের বাড়ি। স্ল্যাং ইউজ করবে না।

'তার দরকার কী? আপনি একটু ডিসেন্ট হোন, অটোমেটিক্যালি আমিও তাই হয়ে যাব।'

আবার চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন উমাপ্রসাদ। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছেন, 'নাউ গেট আউট।'

রণবীর নিরুত্তেজ গলায় বলেছিল, 'আপনি বললেও আমি এখন যেতে পারছি না।'

'মানে?'

'সুদীপার সঙ্গে একবার দেখা করব। তারপর যাব। সেইজন্যেই এসেছি।

'তার কাছে কী দরকার?'

'সেটা তাকেই বলব। শী ইজ গড টু মী।'

'গড?'

'রাইট। সে আমাকে যা দিয়েছে, আপনার বাড়ি-ফাড়ির দাম তার কাছে ফটো পয়সাও না। দয়া করে তাকে একটু ডাকান।'

'বায়োস্কোপের ডায়লগ শুনবার মতো ধৈর্য আমার নেই। তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না।'

'কেন?'

'ডোন্ট ডিসটার্ব আস। আমার মেয়ের জুতোর ফিতে বেঁধে দেবার যোগ্যতা তোমার নেই। তার সঙ্গে লাইফে আর তোমার দেখা হোক, এটা আমি চাই না। প্লীজ গেট আউট।'

'দেখা না করে আমি যাব না।'

'তোমাকে আমি পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করব।'

'সেটা কিন্তু আপনার পক্ষে খুব সম্মানজনক হবে না মিস্টার মিত্র। একটা লোফার অ্যান্টি-সোসালের সঙ্গে সুদীপার নাম জড়িয়ে ঝামেলা পাকিয়ে যাবে। কোর্টে কেস উঠলে খবরের কাগজেও তার রিপোর্ট বেরুবে। বী কোয়ায়েট স্যার।'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! চাবকে তোমার চামড়া গুটিয়ে দেব।'

'নিজের বাড়িতে আমাকে পেয়ে গেলেও সেটা অত সহজ হবে না।'

'শুয়োরের বাচ্চা—'

'আমাকে যা খুশি বলুন কিন্তু আমার বাবাকে কিছু বললে তার রেজাল্ট ভালো হবে না। টেক কেয়ার।'

'ও. কে.। কিন্তু এ রকম ছেলের জন্ম দিলে বাপ আনটাচড থাকতে পারে না। এনিওয়ে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। আর এক সেকেণ্ড দেরি করলে তোমাকে জুতিয়ে বার করে দেব। মহাবীর, বাহাদুর—' বাড়ির চাকর-বাকরদের ডাকতে শুরু করেছিলেন উমাপ্রসাদ।

স্থির চোখে তাঁকে দেখতে দেখতে রণবীর বলেছিল, 'আপনি আমার সঙ্গে আজ যা ব্যবহার করলেন, হোল লাইফ মনে রাখব। এর জন্যে পরে আপনাকে কাঁদতে হবে।' বলে আর দাঁড়ায় নি রণবীর, ঝড়ের গতিতে

বেরিয়ে গিয়েছিল।

কয়েকদিন বাদে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতার পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে একটা মিশনারি কলেজে সুদীপাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ। ঠিক হয়েছিল, ওখানে হোস্টেলে থাকবে সে। ছুটিছাটায় উমাপ্রসাদ নিজে গিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে আসবেন। মেয়েকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, সব সময় সে যেন নিজেদের স্ট্যাটাস, পারিবারিক স্ট্যাণ্ডার্ড—এ সবের কথা মনে রাখে এবং মাথা থেকে রণবীরের মতো একটা থার্ড ক্লাস র‍্যাফায়েনের চিন্তা বার করে পড়াশোনা করে যায়। উমাপ্রসাদ হয়ত ভেবেছিলেন, মেয়েকে কলকাতার বাইরে সরিয়ে দিলে রণবীরের মতো ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

নতুন কলেজে ভর্তি হওয়ার পর দিন দশেক কেটে গেছে। একদিন পর পর চারটে থিওরেটিক্যাল আর একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার পর হোস্টেলে ফিরে রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল সুদীপা। ভিজিটর্স রুমে একজন মাঝবয়সী মহিলা বসে আছেন। চেনা মুখ, কেয়াদের বাড়িতে দু'একবার তাঁকে আগেই দেখেছে সুদীপা। সম্পর্কে ওদের কীরকম আত্মীয়-টাত্মীয় হন।

মহিলাটির গোলগাল নিরীহ টাইপের চেহারা। চোখেমুখে কেমন যেন উদ্বেগ এবং ভয়ের ছাপ ছিল তাঁর। সুদীপাকে দেখে একটু হেসে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'আমাকে চিনতে পারছ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসুন—' মহিলাকে বসিয়ে নিজে তাঁর মুখোমুখি বসতে বসতে সুদীপা বলেছিল, 'আপনি এখানে।'

'তোমার কাছেই এসেছিলাম। একটু দরকার আছে। মানে—' বলতে বলতে বারকয়েক ঢোঁক গিলেছিলেন মহিলা।

সুদীপা বলেছিল, 'দরকারের কথাটা পরে শুনছি। আগে একটু চা দিতে বলি।'

মহিলা বলেছিলেন, 'না-না, চা দিতে হবে না। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।'

সুদীপা শোনে নি। হোস্টেলের রান্নার লোককে দিয়ে চা করিয়ে মিষ্টি আনিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ কী মনে হতে বলেছে, 'আপনি কি এখন কলকাতা থেকে আসছেন?'

খেতে খেতে মুখ তুলে আস্তে মাথা নেড়েছেন, 'হ্যাঁ।'

এই টাইপের মহিলারা এমনিতে একা একা একটা রাস্তায় বেরোন না।

অথচ এঁর সঙ্গে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সুদীপা জিজ্ঞেস করেছে, 'একলাই এসেছেন?'

ভীরু গলায় মহিলা বলেছেন, 'না।'

'তবে?'

গলায় সন্দেশ আটকে গিয়েছিল মহিলার। কাঁপা গলায় বলেছিলেন, 'রণ— রণবীর আমাকে নিয়ে এসেছে।'

মহিলাটিকে দেখার পর থেকে অস্পষ্টভাবে এই রকমই একটা সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছিল সুদীপার। তবু সে চমকে উঠেছে, বলেছে, 'রণবীর কোথায়?'

'বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।' বলে একটু থেমেছেন মহিলা। তারপর কাঁপা ভীরু গলায় বলেছেন, 'ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

ওই হোস্টেলে মেয়েদের আইনসম্মত অভিভাবক ছাড়া অন্য কোন অনাত্মীয় পুরুষের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। সুদীপা বুঝতে পেরেছিল, সেই কারণেই মহিলাটিকে সঙ্গে করে এনেছে রণবীর।

কী করবে, প্রথমটা ঠিক করে উঠতে পারে নি সুদীপা। একবার ভেবেছিল, রণবীরের সঙ্গে দেখা করবে না। নতুন করে জটিলতা না বাড়ানোই ভালো। পরক্ষণেই সে মনঃস্থির করে ফেলেছিল। মহিলার চা খাওয়া শেষ হতেই বলেছিল, 'চলুন।'

মহিলা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেছিল, 'দেখ মা, তোমার সঙ্গে যে দেখা করতে আসছে, রণবীর আমাকে আগে কিছু বলে নি। এখানে ট্রেন থেকে নামার পর বলেছে। তখন তোমার কাছে না এসে উপায় ছিল না।'

সুদীপা উত্তর দেয় নি।

মহিলা আবার বলেছেন, 'তোমার আর রণবীরের ব্যাপারে কিছু কিছু শুনেছি। এ সব গোলমালের ভেতর আমি থাকতে চাই না। কিন্তু—'

সুদীপা এবার বলেছে, 'আপনার কোনো ভয় নেই। একটু দাঁড়ান, হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টকে বলে আসি।' কলেজের সময় ছাড়া বাইরে বেরুতে হলে সুপারিনটেনেডেন্টের পারমিশান লাগত। সুদীপা তাঁকে মিথ্যে বলেছিল। বলেছিল, তার এক মাসীমা দেখা করতে এসেছেন, এখনই চলে যাবেন। তাঁকে রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসতে যাচ্ছে। সুপারিনটেনডেন্ট আপত্তি করেন নি।

হোস্টেলের বাইরে আসতেই বাঁ দিকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ঝাঁকড়া পিপুল গাছের তলায় রণবীরকে দেখতে পেয়েছিল সুদীপা।

মহিলা সুদীপার সঙ্গে রণবীরের কাছে যান নি। কয়েক পা এগিয়ে বলেছিলেন, 'আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি রণবীরের সঙ্গে কথা বল গে।'

রণবীরকে দেখে অদ্ভুত একটা ফীলিং হয়েছিল সুদীপার। সেটা আনন্দ, উত্তেজনা না বিরূপতা, কিংবা এ সব মিলিয়ে অন্য কিছু—সে বোঝাতে পারবে না। বলেছিল, 'কী ব্যাপার, তুমি!'

রণবীর অল্প হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমিই।'

'এখানকার খবর কী করে পেলে!'

'পেয়ে গেলাম। কলকাতা থেকে এ জায়গাটা তো মোটে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে। তোমার বাবা যদি ওয়ার্ল্ডের শেষ মাথায় নিয়ে তোমাকে লুকিয়ে রাখতেন, খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম।'

সুদীপা একটুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর বিব্রতভাবে বলেছে, 'সেদিন বাবা তোমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন। আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। আমি—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়েছে রণবীর। বলেছে 'ওসব থাক। আমি কালও এসেছিলাম। মহিলা আর লীগ্যাল গার্জেন ছাড়া আর কাউকে তোমাদের হোস্টেলে ঢুকতে দেয় না বলে আজ মাসীমাকে সঙ্গে আনতে হল।'

সুদীপা আগেই তা বুঝেছে। বলেছে, 'আমার কাছে কী দরকার তাড়াতাড়ি বল। বেশিক্ষণ হোস্টেলের বাইরে থাকতে পারব না।'

'আজ না; কাল বিকেলে কষ্ট করে এই গাছটার তলায় চলে এসো। তখন বলব। প্লীজ আসবে কিন্তু—'

'আজ সুপারিনটেনডেন্টকে মিথ্যে বলে বেরিয়ে এসেছি। কাল কী বলব? রোজ রোজ এভাবে বেরুনো যায় না।'

'কালই শুধু, আর তোমাকে ডিসটার্ব করব না। প্লীজ, প্লীজ, কাল আসবে কিন্তু—'

'দরকারী কথাটা আজই বলে ফেল না।'

'আজ বলা যাবে না। কাল, কাল—'

'দেখি—'

পরের দিন ছুটির পর আগে হোস্টেলে যায় নি সুদীপা। সোজা পিপুল গাছটার তলায় চলে এসেছিল। তার ভয় ছিল, আগে হোস্টেলে গেলে তার পক্ষে বেরুনো সম্ভব হবে না।

আজ আর সেই মহিলাটিকে সঙ্গে আনে নি রণবীর। গাছতলায় সে একাই দাঁড়িয়ে ছিল।

সুদীপা বলেছিল, 'অনেক রিস্ক নিয়ে চলে এলাম। বুঝতেই পারছ, জানাজানি হলে—' হঠাৎ থেমে বলেছে, 'কী দরকার বল?'

রণবীর বলেছিল, 'আমার সঙ্গে একটা জায়গায় তোমাকে যেতে হবে।'

সুদীপা চমকে উঠেছে, 'কোথায়?'

'কাছেই। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। পনের মিনিটের ভেতর তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

'গাড়ি কোথায়?'

রণবীর ডানদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছিল। সামনের বাঁকের মুখে সত্যিই একটা সবুজ প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে।

সুদীপা বিমূঢ়ের মতো বলেছে, 'কী ব্যাপার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'গেলেই বুঝতে পারবে। এসো এসো।'

দ্বিধান্বিতভাবে সুদীপা বলেছে, 'কিন্তু—'

রণবীর এবার বলেছিল, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না।'

আগেও অনেকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু কখনও রণবীর এমন কোনো আচরণ করে নি যাতে তাকে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করা যায়। সুদীপা বলেছে, 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। তুমি বোধহয় জানো না, এখানকার হোস্টেলের মেয়েদের কড়া ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকতে হয়। তাদের চলা-ফেরা ওঠা-নামা—সব কিছুর ওপর সারাক্ষণ ওয়াচ রাখা হচ্ছে।'

'মোটে পনের মিনিট। প্লীজ—'

কখনও জোরজার, কখনও কাকুতি-মিনতি করে শেষ পর্যন্ত সবুজ প্রাইভেট কারে সুদীপাকে তুলে ফেলেছিল রণবীর। গাড়িতে মধ্যবয়সী ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুদীপারা উঠতে সে স্টার্ট দিয়ে মুহূর্তে স্পীড তুলে ফেলেছিল।

সেই মফঃস্বল শহরটা ছিল খুবই ছোট। দু' মিনিটের ভেতর গাড়িটা তার বাউণ্ডারি ছাড়িয়ে বাইরের খোলা জায়গায় এসে পড়েছিল। সেখানে দু'ধারে ধানের ক্ষেত। দূরে দূরে এক-আধটা গ্রাম। রাস্তাতেও লোকজন নেই; ক্বচিৎ কখনো দু'-একটা গাড়ি হুস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মিনিট বারো পরও গাড়িটা যখন একই রকম স্পীডে ছুটতে লাগল তখন কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সুদীপা। বলেছিল, 'ছুটির পর সব মেয়ে হোস্টেলে ফিরে গেছে। আমার পক্ষে আর বাইরে থাকা সম্ভব না। ফিরে চল।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে খুব নিস্পৃহ গলায় রণবীর বলেছিল, 'এখন ফেরা যাবে না।'

'কেন?'

'দরকারী কাজটা এখনও হয় নি, তাই।'

'কখন কাজটা শেষ হবে?'

'এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না।'

'তার মানে!' গলার স্বরটা কেঁপে গিয়েছিল সুদীপার।

রণবীর উত্তর দেয় নি।

সুদীপা বলেছিল, 'তুমি না বলেছিলে পনের মিনিটের ভেতর আমাকে হোস্টেলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে!'

রণবীর বলেছিল, 'না বললে তুমি গাড়িতে উঠতে না।'

'তোমার মোটিভটা কী?'

রণবীর চুপ।

সুদীপা কিন্তু থাকে নি। তাকে হোস্টেলে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনবরত অনুরোধ আর কাকুতি-মিনতি করে গেছে।

মিনিট পঁচিশেক বাদে গাড়িটা একটা গ্রামে ঢুকে একেবারে শেষ মাথায় পুরনো আমলের ভাঙাচোরা একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অনেকগুলো ছোকরা, সবাই রণবীরের সমবয়সী—বাড়িটার সামনের উঁচু বারান্দায় বসে ছিল। সবারই মুখ চেনা। কলকাতায় রণবীরের বাড়ির রোয়াকে বা উল্টো দিকের চায়ের দোকানে দিনরাত ওরা আড্ডা মারত। দু'-চারজনের নাম এখনও মনে আছে সুদীপার—নেপাল, হরেন, রমেশ ইত্যাদি।

ছোকরাগুলো হৈ-হৈ করে বারান্দা থেকে লাফিয়ে গাড়িটার কাছে দৌড়ে এসেছিল। কোরাসে চেঁচাতে শুরু করেছিল, 'গুরু আ গিয়া, গুরু আ গিয়া। উরি ব্বাস, সঙ্গে করে বৌদিকেও নিয়ে এসেছে রে!'

ভিড়ের ভেতর গলার স্বর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে কে যেন বলেছিল, 'রণা, তুই যা করলি হিন্দী ফিলিমের হীরোরা ফোরটিন জেনারেশনেও তা করতে পারবে না।'

ওদের কথা শুনতে শুনতে গলগল করে ঘামতে শুরু করেছিল সুদীপা।

এদিকে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল রণবীর। নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের থামিয়ে সুদীপাকে বলেছে, 'নেমে এসো।'

রণবীরের ঐ সব বাজে টাইপের সঙ্গীদের দেখে মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল সুদীপার। সেই সঙ্গে বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা ভয়ও টের পাচ্ছিল। সে

বলেছে, 'না, আমি নামব না।'

রণবীর বলেছে, 'নামো—' বলে সোজা সুদীপার চোখের দিকে তাকিয়েছে।

সুদীপা এবার ভয়টাকে প্রবল শক্তিতে সরিয়ে নেমেই পড়েছিল। আচমকা এক দুর্জয় সাহস তাকে যেন বেপরোয়া করে তুলেছিল। তখনও দিন ফুরিয়ে যায় নি, আকাশে রোদ রয়েছে। দেখাই যাক, রণবীররা কতদূর যেতে পারে।

রণবীর বলেছিল, 'ভেতর চলো।'

তখনও সুদীপা জানত না, ওই গ্রামটা রণবীরের সারাক্ষণের সঙ্গী নেপালদের। বাড়িটাও তাদেরই। তাকে ওখানে কেউ থাকত না। ভাঙাচোরা পুরনো নড়বড়ে বাড়িটা রাজ্যের জঞ্জাল আর আগাছা নিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে ছিল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই এক ফুঁয়ে বাতি নিভে যাবার মতো সেই সাহসটুকু মুছে গিয়েছিল সুদীপার। সে বুঝতে পারছিল মারাত্মক এক ফাঁদে পড়ে গেছে। তার হাত-পায়ের জোড় যেন আলগা হয়ে যেতে শুরু করেছিল।

ভেতরের উঠোনে জঞ্জাল আর আগাছা সাফ করে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। একটা বুড়ো থুত্থুড়ে পুরুত একধারে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। বোঝা যাচ্ছিল, তাকে ভয়টয় দেখিয়ে আনা হয়েছে। কোনো মহিলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। হোস্টেল থেকে তাকে নিয়ে আসার কারণটা এতক্ষণে সুদীপার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

তারপর কী হয়েছিল, মনে নেই। অদ্ভুত এক ঘোরের ভেতর একটা বিয়ের অনুষ্ঠানই বোধহয় হয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় পুরুতের সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ সুদীপার কানে সৌরজগতের ওপারের কোন দুর্বোধ্য শব্দের মতো মনে হচ্ছিল।

একসময় নিজেকে একটা ঘরের ভেতর আবিষ্কার করেছিল সুদীপা। তখন অন্ধকার। কখন সন্ধ্যে নেমেছিল সে জানে না। দু'ধারে দুটো বড় লণ্ঠন জ্বলছিল। মেঝের একধারে ফুলটুল দিয়ে সাজানো একটা নতুন বিছানা। তার তিন ফুট দূরে রণবীর দাঁড়িয়ে।

এরকম একটা মারাত্মক ব্যাপার কারো জীবনে কখনও ঘটেছে বলে সুদীপা শোনে নি। সেই মুহূর্তে তার কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছিল না সুদীপা। হঠাৎ দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছিল সে।

আর তখনই রণবীরের বজ্জাত বন্ধুরা বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করতে করতে বলেছিল, 'রণা, শেকল তুলে দিলাম। এবার হোল নাইট

হানড্রেড মাইল স্পীডে ফুর্তি চালিয়ে যা।' বলে হল্লা বাধিয়ে হেসে উঠেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সুদীপা। মুখ থেকে হাত সরাতেই চোখে পড়েছিল আঙুলে সিঁদুর লেগে আছে। সমস্ত অস্তিত্ব দুমড়ে ফাটিয়ে একটা কান্না বেরিয়ে এসেছিল তার, 'এ তুমি কী করলে?'

রণবীর বলেছিল, 'আমার এ ছাড়া উপায় ছিল না।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো সুদীপা বলেছিল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। এখনও হোস্টেলে ফিরে গেলে—'

'তা আর হয় না।'

সেই সাহসটাকে প্রাণপণে ফিরিয়ে এনে সুদীপা এবার বলেছিল, 'না ছাড়লে আমি চিৎকার করব।'

রণবীর বলল, 'কোনো লাভ নেই। আসবার সময় নিশ্চয়ই দেখেছ, আসল গ্রামটা এখান থেকে অনেক দূরে। চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না।'

'আমার বাবা তোমাকে অপমান করেছিলেন বলে এভাবে রিভেঞ্জ নিলে?'

'রিভেঞ্জ না।' বলে একটু চুপ করে থেকে রণবীর বলেছে, 'তোমার বাবার কাছে আমি গ্রেটফুল। তিনি তোমাকে এই মফঃস্বল টাউনে পাঠিয়ে দেবার পরই টের পেলাম তোমাকে ছাড়া আমার জীবন ইনকমপ্লীট। তোমাকে আমার চাই-ই। তাই—'

'এর রেজাল্ট কী হবে জানো?'

'খুব খারাপ হবারই সম্ভাবনা। তবু একটু রিস্ক নিয়ে তোমাকে দাগী করে দিলাম। কেন করলাম, সেটা তুমি পরে বুঝতে পারবে।'

যতদূর মনে আছে, সেই বাড়িটায় তিনটে দিন রণবীররা তাকে আটকে রেখেছিল। তারপর চতুর্থ দিন এসেছিল পুলিশ, তাদের সঙ্গে উমাপ্রসাদ।

এমনিতে বাবা ছিলেন সাহেবী মেজাজের মানুষ। দারুণ ফিটফাট। তাঁর ট্রাউজার্স বা শার্টের প্রতিটি ক্রীজ থাকত অটুট, টাইয়ের 'নট' নিখুঁত, গাল মসৃণভাবে কামানো, সিঁথির রেখাটি একচুল এধার ওধার হবার উপায় ছিল না। সেই উমাপ্রসাদকে তখন আর চেনা যাচ্ছিল না। চুল উস্কখুস্ক, খাপচা খাপচা দাড়ি। চোখ দুটো টকটকে লাল, তার নিচে কালির পোঁচ। দেখেই বোঝা যায়, কয়েক রাত তিনি ঘুমোন নি। পরনে আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি।

বাবাকে দেখেই দৌড়ে এসে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুদীপা। ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। আর বাবা রণবীরের দিকে আঙুল তুলে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'অ্যারেস্ট দ্যাট বাস্টার্ড।'

রণবীর বাধা দেয় নি বা পালাবারও চেষ্টা করে নি। গভীর চোখে কয়েক পলক সুদীপার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে পুলিশ অফিসারের কাছে এসে দু'-হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু সে-ই না, তার বন্ধুদের কয়েক জনকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। বাকি সবাই পুলিশ ভ্যান দেখেই পালিয়ে গেছে।

এরপর সমস্ত ব্যাপারটা চলে গিয়েছিল কোর্টে। বেশ কয়েক বছর বাদে উমাপ্রসাদ আবার গাউন পরে আদালতে গিয়েছিলেন। জীবনে এটাই তাঁর শেষ কেস। একগুঁয়ে একটা জেদ আর প্রতিহিংসা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। রণবীর তাঁর মানমর্যাদা, পারিবারিক সুনাম এবং সুদীপার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি তাকে ছাড়বেন না, যেভাবেই হোক ধ্বংস করে দেবেন।

আশ্চর্য, রণবীরের তরফে কোন ল-ইয়ার ছিল না। সুদীপা শুনেছে, তাদের বাড়ি থেকে উকিল দিতে চেয়েছিল, রণবীর রাজী হয় নি। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তার মা বাবা, এমন কি কেয়া পর্যন্ত সুদীপার বাড়ি দৌড়ে এসেছিল। উমাপ্রসাদ তাদের ভেতরে ঢুকতে দেন নি।

কেসটা দু' মাসের মতো চলেছিল। প্রায়ই সুদীপার ডাক পড়ত কোর্টে। বাবা বাড়িতে যা যা শিখিয়ে পড়িয়ে দিতেন, কোর্টে গিয়ে সে গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতেন। উল্টো দিকে আসামীর কাঠগড়ায় তখন দাঁড়িয়ে থাকত রণবীর। পারতপক্ষে সে তার দিকে চোখ ফেরাত না। তবু বুঝতে পারত, রণবীর পলকহীন তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

একতরফা এই কেসে সাক্ষীদের জেরা-টেরা হয়ে যাবার পর উমাপ্রসাদ রণবীরকে নিয়ে পড়েছিলেন। রণবীর তাঁর বেশির ভাগ কথারই উত্তর দেয় নি বা নিজেকে বাঁচাবারও চেষ্টা করে নি। ফলে দু' মাস বাদে যে রায় বেরিয়েছিল তাতে সুদীপাকে কিডন্যাপ করা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেআইনি একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করে তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস ইত্যাদি মারাত্মক সব কারণে রণবীরের পাঁচ বছর জেল হয়ে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে সাহায্য করার অপরাধে তার বন্ধুদের কারো ছ' মাস, কারো তিন মাস, কারো বা এক মাস জেল হয়েছিল।

ইচ্ছা করলে রণবীর হায়ার কোর্টে আপীল করতে পারত; করে নি। সে যেন গোড়া থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, জেল খাটবেই।

সুদীপার মনে পড়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সেই সময় তার শরীর এবং মনের ওপর দিয়ে যা বয়ে গিয়েছিল তার জের চলেছিল অনেকদিন।

প্রায় সারাদিন চুপচাপ নিজের ঘরে শুয়ে বা বসে থাকত সে। পৃথিবী তার কাছে একেবারেই বিস্বাদ, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত এক শূন্যতা আর অন্ধকারের ভেতর ক্রমশ সে যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। অনুভূতির ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছুই ভালো লাগত না। বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে তাকে খেতে হত, স্নানও করতে হত, একটু-আধটু ঘুমোতেও হত। কিন্তু কোনোটাই নিজের ইচ্ছায় না, বাবা বা ঠাকুমার অনবরত তাগাদায়।

মনে আছে, কেসের রায় বেরুবার পর বেশ কয়েকদিন বাবা অফিসে বেরুতেন না; তার কাছে কাছেই থাকতেন। আর ঠাকুমা তো তাকে মা-পাখির মতো সারাদিন আগলে আগলেই রাখতেন।

বাবা বলতেন, 'বী স্টেডি। মনে করো ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট বা নাইটমেয়ার। ট্রাই টু ফরগেট দ্যাট। লাইফ একটা আশ্চর্য ব্যাপার রঞ্জু; যখন ইচ্ছা নতুন করে শুরু করা যায়।'

ঠাকুমাও তাকে রণবীরের কথা ভুলে যেতে বলতেন। বোঝাতেন, 'মনে শক্তি আন দিদি। সামনে পুরা জীবন পইড়া আছে। এইভাবে ভাইঙ্গা পড়লে তো চলব না!'

সুদীপা বিমূঢ়ের মতো শুধু বাবা আর ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে থাকত।

এইভাবে মাসখানেক কেটে গেছে। তারপর হঠাৎ একদিন বাথরুমে যেতে গিয়ে শরীরের ভেতর কী যেন একটা বিপর্যয ঘটে গিয়েছিল। মাথা ঘুরে টলে পড়তে পড়তে হড়হড় করে বমি করে ফেলেছিল সে।

ঠাকুমা পাশেই বসে ছিলেন। দৌড়ে এসে তাকে তুলে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রায়ই বমি হতো সুদীপার; আর সমস্ত শরীরে কিরকম যেন একটা আলোড়ন অনুভব করত। এই সময়টা প্রায় সারাক্ষণই ঠাকুমার চোখ তার ওপর আটকে থাকত।

দিনকয়েক লক্ষ্য করার পর হেমনলিনী উদ্বেগের গলায় উমাপ্রসাদকে বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু ভালো বুঝি না। তুই ডাক্তার ডাক নান্টু। চিনা (চেনা) ডাক্তার না—'

বাবা তাদের বাড়ির ফিজিসিয়ানকে ডাকেন নি, নর্থ ক্যালকাটা থেকে অন্য ডাক্তার 'কল' দিয়ে এনেছিলেন। পরীক্ষা-টরীক্ষা করে ডাক্তার বলেছিলেন, 'শী ইজ ক্যারিয়িং। তিন চার মাসের বাচ্চা রয়েছে পেটে।'

ঠাকুমার সতর্কতার কারণ বোঝা গিয়েছিল। প্রেগনান্সির ব্যাপারটা জানাজানি হোক, এটা তিনি চান নি। তাঁদের পারিবারিক ডাক্তার কাছেই থাকেন। তাঁর মুখ থেকে কোনোভাবে খবরটা বেরিয়ে গেলে এ পাড়ায় মুখ

দেখানো যাবে না।

ডাক্তার চলে যাবার পর হেমনলিনী আর উমাপ্রসাদ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন নি; বাজপড়া মানুষের মতো বসে ছিলেন। তারপর একসময় চাপা অবরুদ্ধ গলায় বাবাই বলেছিলেন, 'এই পাপের চিহ্ন রাখব না। যেভাবে হোক ফ্রি করিয়ে নিতে হবে।'

পুরনো কালের মানুষ হলেও ছেলের এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল হেমনলিনীকে। সামান্য একটা অপারেশনের ব্যাপার। তা হলেই সব লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে সুদীপা। যে ধাপ্পাবাজ দুশ্চরিত্র রাফায়েন জেল খাটছে, তার বাচ্চার মা হবার মতো গ্লানিকর এবং অসম্মানজক ঘটনা আর কী থাকতে পারে?

কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, আসলে তা নয়। ডাক্তাররা সুদীপাকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, অ্যাবরশান তার স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। তাছাড়া সুদীপার শরীরে এমন কিছু গোলমাল রয়েছে যাতে এই সন্তান নষ্ট করার ফলে ভবিষ্যতে আর হয়ত কোনো বাচ্চাই হবে না।

প্রবল মনের জোর উমাপ্রসাদের। তিনি স্থির করে ফেলেছিলেন, কলকাতায় থাকবেন না। এখানকার বাড়ি-টাড়ি কয়েক মাসের জন্য ঠাকুর, চাকর, মালি, দারোয়ানদের আর অফিসের দায়িত্ব বিশ্বাসী কর্মচারীদের হাতে দিয়ে সুদীপা এবং হেমনলিনীকে নিয়ে বম্বে চলে গিয়েছিলেন। বারো শো মাইল দূরে বিশাল সেই মেট্রোপলিসে লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে থাকার অনেক সুবিধা। সেখানেই সুদীপার বাচ্চা হয়ে যাবার পর নর্থ বেঙ্গলে এক অরফ্যানেজে তার থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। তারপর মেয়েকে বম্বেরই এক কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানে হোস্টেলে থেকে বি.এস-সি. পড়বে।

বি. এস-সি. পাশ করার পর তাকে বম্বে থেকেই লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ। আর্কিটেকচারে ডিগ্রি নিয়ে ছ'বছর বাদে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিল সে।

তাকে এভাবে এতগুলো বছর কলকাতা থেকে অনেক দূরে বোম্বাই এবং লণ্ডনে রেখে দেবার মধ্যে উমাপ্রসাদের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, রণবীরের সঙ্গে জড়ানো সেই গ্লানিকর অতীতটাকে তার মন থেকে একেবারে মুছে ফেলা। দুই, ক্রমশ তাকে স্বাভাবিক হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া। উমাপ্রসাদেরর ধারণা, সুদীপা কলকাতায় থাকলে এই দুটোর কোনোটাই

সম্ভব না। এখানে থাকলে রণবীরকে যেভাবে তার মনে পড়বে, কয়েক হাজার মাইল দূরে লণ্ডনে সেভাবে পড়বে না। অবশ্য সুদীপাকে আর্কিটেক্ট করিয়ে আনার পেছনে উমাপ্রসাদের আরো একটা পরিকল্পনা ছিল। সে এসে তাঁর হাউসিং কনসার্নের অনেকটা দায়িত্ব নিতে পারবে।

লণ্ডনে থাকতে রণবীরকে কি তার কখনও মনে পড়ত না? নিশ্চয়ই পড়ত। কিন্তু ঐ বিশাল মেট্রোপলিসের চোখ-ধাঁধানো চমক, নানা দেশের মানুষ, নতুন নতুন বন্ধুবান্ধব, ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে ইওরোপের নানা দেশে এক্সকার্সান এবং পড়াশোনার চাপ—সব মিলে সেই লজ্জাকর অতীতটাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল আর রণবীর ক্রমশ তার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

ছ' বছর আগে যখন উমাপ্রসাদ সুদীপাকে বোম্বাই নিয়ে গিয়েছিলেন তখন তার বয়স উনিশ। লণ্ডন ঘুরে আর্কিটেকচারে ডিগ্রি নিয়ে আবার যখন সে কলকাতায় ফিরল তখন পঁচিশ পেরুতে চলেছে। এই ছ' বছরে সুদীপা আর বালিকাটি নেই। জীবন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিত্বও।

কলকাতায় ফিরেই কিন্তু সুদীপা টের পেল, তার স্মৃতি বা ভাবনায় সেই ঘটনার গভীর দাগটা অনেকখানি ফিকে হয়ে গেলেও একেবারে মুছে যায় নি। মনের কোনো তলদেশ থেকে অগুনতি স্তর ঠেলে ঠেলে রণবীর উঠে এসেছিল যেন। সুদীপা জানত, তার পাঁচ বছরের জেল হয়েছে। তার মানে সে দেশে ফেরার আগেই রণবীর ছাড়া পেয়েছে। সে তখন কোথায় আছে কী করছে, কেয়াই বা কী করছে বা তার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা—এ সব জানার জন্য হঠাৎ অদম্য এক কৌতূহল তাকে পেয়ে বসেছিল যেন।

লণ্ডনে থাকতে ড্রাইভিংটা শিখে নিয়েছিল সুদীপা। একদিন ঠাকুমা বা বাবাকে 'একটু ঘুরে আসি' বলে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ছ' বছর আগে বাবা তাকে একা কোথাও ছাড়তেন না; পাহারাদার হিসেবে বিশ্বাসী ড্রাইভারকে সঙ্গে দিতেন। লণ্ডন থেকে ফেরার পর সে প্রশ্ন আর ওঠে না। বিলেত-ফেরত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পঁচিশ বছরের মেয়েকে আগলে রাখার কথা ভাবা যায় না। তা ছাড়া উমাপ্রসাদ সুদীপা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্তই হয়ে গিয়েছিলেন। সেই বিশ্রী ঘটনাটা নিয়ে নিশ্চয়ই মেয়ে আর মাথা ঘামায় না। দ্যাটস এ ফরগটন চ্যাপ্টার।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এধারে-ওধারে খানিকটা ঘুরে কেয়াদের পাড়ায় চলে এসেছিল সুদীপা। এসে অবাক হয়ে গেছে। কেয়াদের সেই বস্তি টাইপের

টিনের বাড়িটা আর নেই। সেই জায়গায় হাই-রাইজ বিল্ডিং উঠেছে। উল্টো দিকের চায়ের দোকানটাও দেখা যায় নি; সেখানে একটা চিলড্রেন্স পার্ক হয়েছে। কাউকে জিজ্ঞেস করে যে ওদের কথা জেনে নেবে, তারও উপায় ছিল ন। কেননা, রণবীরের সাঙ্গোপাঙ্গদেরও আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। অবশ্য দেখা হলেও সুদীপা তাদের সঙ্গে হয়ত কথা বলত না।

ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ চিলড্রেন পার্কের গায়ে বিউটি স্টোর্সের দিকে চোখ পড়েছিল সুদীপার। মাঝারি ধরনের এই স্টেশনারি দোকানটা অনেক কালের পুরনো। ছ' বছরেও ওখানে কিছুই বদলায় নি। এই রাস্তা দিয়ে স্কুল-কলেজে যাবার সময় রোজই দোকানটা চোখে পড়ত।

সেই চেনা দোকানদারটাকেও দেখা গেল। উঁচু টুলের ওপর বসে আগেকার মতোই বেচাকেনা করছিলেন। এই ক'বছরে বয়সটা যেন হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে ভদ্রলোকের। চুলগুলো ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

কী ভেবে গাড়ি থেকে নেমে সোজা 'বিউটি স্টোর্সে' চলে গিয়েছিল সুদীপা। খুব একটা ভিড়-টিড় ছিল না। তবু তাকে দেখে দোকানদার ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, 'আপনাকে কী দেব মা?'

দোকানদার সুদীপাকে চিনতে পারেন নি। ছ' বছর আগে রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই তাকে যাতায়াত করতে দেখেছেন। কিন্তু তার চেহারা আগের মতো নেই, অনেকটা বদলে গেছে। তখন তার পরনে জীনস আর শার্ট, চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, চোখে প্রকাণ্ড সান-গ্লাস, বাঁ হতে ঢাউস ইলেকট্রনিক ঘড়ি। সুদীপা বলেছিল, 'আপনি সবাইকে দিয়ে দিন। তারপর আমি নিচ্ছি।'

দ্রুত অন্য খদ্দেরদের বিদায় করে দোকানাদার অনেক আশা আর আগ্রহ নিয়ে সুদীপার দিকে তাকিয়েছিলেন।

দরকার ছিল না, তবু একগাদা কসমেটিকস দিতে বলেছিল সুদীপা। তাক এবং আলমারি থেকে নানা ধরনের সুদৃশ্য সব শিশি আর কৌটা নামিয়ে এনে দোকানদার যখন হিসেব করছেন, সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাকে একটা খবর দিতে পারেন?'

দোকানদার মুখ তুলে চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'কী খবর?'

উল্টো দিকের হাই-রাইজ বিল্ডিংটা দেখিয়ে সুদীপা বলেছিল, 'ওখানে ক'বছর আগে একটা টিনের বাড়ি ছিল। আমার এক বন্ধু ওখানে থাকত। ক'বছর কলকাতায় ছিলাম না; এখন দেখছি বাড়িটা নেই—'

কী একটা চিন্তা করে দোকানদার বলেছিলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়ছে, ওখানে তো রণবীররা থাকত! ছোকরা এমনিতে খারাপ ছিল না, পরে অত্যন্ত বজ্জাত আর হারামজাদা হয়ে উঠেছিল।'

সুদীপা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কী উত্তর দেবে যখন ভাবছে, সেই সময় দোকানদার ফের বলে উঠেছিলেন, 'অবশ্য ওর মা বাবা বোন, সবাই ছিল বড় ভালো।'

সুদীপা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছে, 'ওর বোন কেয়া আমার বন্ধু, আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত।''

'আপনি ওদের খবর চান?'

সুদীপা চমকে উঠেছিল। অদ্ভুত এক ঝোঁকের মাথায় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। রণবীররা যদি এখানে থাকতও, সে দুম করে কি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত? যে তার জীবনে চরম এনে বিপর্যয় দিয়েছিল, তার খোঁজ নেবার জন্য কেন যে সে হঠাৎ ছুটে এসেছিল তা তার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য। সুদীপা বলেছিল, 'মানে ওরা কোথায় থাকে, জানতে পারলে ভালো হতো।'

দোকানদার বলেছিলেন, 'আপনি এক কাজ করুন মা—'

'বলুন।'

'ডান দিকে সোজা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে খানিকটা গেলেই একটা তেতলা বাড়ি পাবেন—উমাপ্রসাদ মিত্রের বাড়ি। উমাপ্রসাদবাবু হয়ত ওদের খবর দিয়ে পারবেন।'

শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কী যেন খেলে গিয়েছিল সুদীপার। বলেছিল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।' বলতে বলতে তার মতো স্মার্ট মেয়েরও গলার স্বর কেঁপে গিয়েছিল।

দোকানদার বলেছিলেন, 'কয়েক বছর আগে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল। উমাপ্রসাদবাবুর মেয়ের সঙ্গে রণবীর কী যেন বাঁদরামি করতে যায়। রেগে উমাবাবু কেস-টেস করে ওকে জেলে পোরেন। রণবীর যখন জেলে, সেই সময় উমাবাবু ওদের বাড়িওয়ালার কাছ থেকে টিনের বাড়িটা কিনে ওর মা-বাবাকে উৎখাত করে দেন। এর জন্য কোর্ট-টোর্ট পুলিশ গুণ্ডা—অনেক কিছু করতে হয়েছে তাঁকে। ওরা যাবার পর উমাবাবু পুরনো বাড়ি ভেঙে একশো ফ্ল্যাটের ঐ মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংটা তৈরি করে এককেটা ফ্ল্যাট একেকজনকে বিক্রি করে দেন। সেই জন্যেই বলছি, রণবীররা কোথায় উঠে গেছে, উমাপ্রসাদবাবু হয়ত জানেন।'

সুদীপা বুঝতে পারছিল, দূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই বাবা রণবীরদের এ পাড়া থেকে উৎখাত করে দিয়েছেন। তিনি জানতেন পাঁচ বছর জেল খাটার পর রণবীর এখানেই ফিরে আসবে। আর চিরকাল লণ্ডনে পড়ে থাকবে না সুদীপা। কাছাকাছি থাকলে নতুন করে জটিলতা আর সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই সুদীপা লণ্ডন থেকে ফেরার আগেই তিনি রণবীরদের এ পাড়া থেকে একরকম জোর করেই তুলে দিয়েছিলেন।

সুদীপা দোকানদারকে আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। দাম-টাম মিটিয়ে কসমেটিকসের প্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

দোকানদারের কাছে সব জানলেও বাবাকে রণবীরের কথা জিজ্ঞেস করে নি সুদীপা, ঠাকুমাকেও না। সেটা সম্ভবও ছিল না। তবে হেমনলিনীর কাছে সে অন্য কথা জানতে চেয়েছিল।

বোম্বাই বা লণ্ডনে থাকতে রণবীরের চাইতেও যার কথা অনেক বেশি মনে পড়ত সে হল তার সন্তান। বাচ্চাটাকে নিজের চোখে সে দ্যাখে নি। পরে বাবা বলেছিলেন, বাচ্চা ভালো আছে, সুস্থ আছে, তবে তার কথা যেন সুদীপা ভুলে যায়। কিন্তু তাকে ভোলা যায় নি। দূর বিদেশে অদেখা সেই সন্তানের জন্য প্রায়ই সে অস্থির হয়ে উঠত।

হেমনলিনীকে সুদীপা জিজ্ঞেস করেছে, 'ঠাকুমা, একটা কথা বলব?'

ঠাকুমা বলেছেন, 'কী রে?'

'সে কোথায় আছে?'

হেমনলিনী বুঝতে পেরেছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণ গলায় বলেছেন, 'তার কথা ভুইলা যা দিদি।'

সুদীপা বলেছে, 'ভোলা কি যায়! তুমিই বলো।'

হেমনলিনীর সত্তর বছরের জীর্ণ হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছিল। এবার তিনি কিছু বলেন নি।

সুদীপা আবার বলেছে, 'সে কি বেঁচে আছে?'

হেমনলিনী মাথা নেড়েছে, 'আছে।'

'কোথায় আছে?'

'তর বাপ জানে।'

'তুমি জানো না?'

'ভাসা ভাসা শুনছি, কার্সিয়াঙের কাছে কই জানি থাকে।'

'তুমি তাকে দেখেছ?'

'না দিদি।'

একটু চুপ। তারপর সুদীপা হেমনলিনীর কোলে মুখ গুঁজে বলেছে, 'ওকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে।'

গভীর স্নেহে হেমনলিনী তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলেছেন, 'দেখি তর বাপেরে কইয়া।'

হেমনলিনী উমাপ্রসাদকে কিছু বলে থাকবেন। উমাপ্রসাদ একদিন সুদীপাকে বলেছিলেন, 'ডোন্ট বী ইমোশোনাল রঞ্জু। ঐ ব্যাপারটা নিয়ে আবার যদি নাড়াচাড়া ভাবাভাবি শুরু কর, অনেকরকম প্রবলেম তৈরি হবে।'

ঝাপসা গলায় সুদীপা বলেছিল, 'আমি শুধু একবার দূর থেকে দেখতে চাই বাবা।'

'না—না, ওসব মাথা থেকে বার করে দাও। এক মাস হলো লণ্ডন থেকে এসেছ। এবার আমার সঙ্গে তোমাকে অফিসে বেরুতে হবে।'

সুদীপা আর কিছু বলে নি।

এর কয়েকদিন বাদেই উমাপ্রসাদ সুদীপাকে নিয়ে অফিসে যেতে শুরু করেছিলেন। প্ল্যানিং আর আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের চার্জে ছিলেন তখন সুবিনয় চ্যাটার্জি। উমাপ্রসাদের বন্ধু এই মানুষটি ছিলেন বিরাট আর্কিটেক্ট। খুবই স্নেহপ্রবণ। বাবা তাঁকে বলেছিলেন, 'রঞ্জুকে তোমার ডিপার্টমেন্টে দিলাম। ওকে একটু কাজকর্ম শিখিয়ে দিও।'

সুবিনয়কাকা বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই। তুমি আমি আর ক'দিন। তারপর রঞ্জুকেই তো এই অফিসের রেসপনসিবিলিটি নিতে হবে। শুধু আমার ডিপার্টমেন্টেই না, অন্য সব ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মও ওর জানা দরকার।'

'ঠিকই বলেছ। সব ডিপার্টমেন্টে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করব।'

আর্কিটেকচারের বড় মাপের ফরেন ডিগ্রী সুদীপার ছিল ঠিকই, কিন্তু হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা তার ছিল না। খুব যত্ন করে সুবিনয় তাকে কাজ শিখিয়েছিলেন। শুধু তিনিই নন, অন্য ডিপার্টমেন্টাল ইনচার্জরাও সুদীপাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময়টা সকালে স্নান-টান করে ব্রেকফাস্ট সেরে বাবার সঙ্গে অফিসে চলে যেত সুদীপা। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যেয় বাবার সঙ্গেই বাড়ি ফিরত। কোনো কোনো দিন ফিরতে বেশ রাতও হয়ে যেত। সারাদিন এত খাটতে হত যে বাড়ি ফিরে কোথাও বেরুবার মতো এনার্জি থাকত না। রেডিওগ্রামে দু'একটা গান-টান শুনে রাতের খাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়ত। পরের দিন আবার সেই একই রুটিন। একটা দিন যেন আরেকটা দিনের হুবহু

কার্বন কপি।

ছুটিছাটা বলে কিছু ছিল না সুদীপার। রবিবারও বাবা তাকে সঙ্গে করে অফিসে যেতেন। যত দিন যাচ্ছিল, কাজের প্রেসার তত বাড়ছিল। প্রতিটি দিন চব্বিশ ঘণ্টার বদলে পঞ্চাশ ঘণ্টা করে হলে বোধহয় ভাল হত। যাই হোক, ছুটির দিনে অন্য এমপ্লয়ীরা অবশ্যই আসত না। তবে সুবিনয়কাকার মতো যে ক'জন তাদের এই কনসার্নের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা আসতেন।

এই ট্রেনিং পিরিয়ডের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। অদ্ভুত এক যোগাযোগে নিজের সেই অদেখা সন্তানের অনেক খবর সে জানতে পেরেছিল।

শরীর খারাপের জন্য সেদিন অফিসে যায় নি সুদীপা। দুপুরে বাগানে রঙীন ছাতার তলায় বসে মডার্ন আর্কিটেকচারের একটা বই দেখছিল। ওধারে মালীরা কাজ করছে। এই সময় পিওন একটা রেজিস্টার্ড চিঠি নিয়ে এল।

চিঠিটা উমাপ্রসাদের। সই করে সেটা নিয়ে পাশের একটা চেয়ারে রাখতে গিয়ে দেখল, বাঁ দিকে তলায় লেখা আছে ঃ ইফ আন-ডিলিভারড, প্লীজ রিটার্ন টু মাদার মেরি অরফ্যানেজ, কার্সিয়াঙ, ওয়েস্ট বেঙ্গল। বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সুদীপার। অস্পৃষ্টভাবে সে শুনেছে, তার অদেখা ছেলে থাকে নর্থ বেঙ্গলের কোনো অনাথ আশ্রমে। আশ্রমটার ঠিকানা বা নাম সে এতদিন জানতে পারে নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল, এই মাদার মেরি অরফ্যানেজেই সে আছে, নিশ্চয়ই আছে। অপরিসীম উত্তেজনায় তার রক্তের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক কাঁপুনি উঠে আসতে শুরু করেছিল। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে প্রবল আলোড়ন চলছিল।

এমনিতে সে অন্যের চিঠি পড়ে না। রুচিতে আটকায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল সুদীপা। আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে এনভেলপ খুলে চিঠিটা বার করে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেছে। জানতে পেরেছে তার রক্তের অংশ সেই অজানা সন্তানের নাম দেবাশিস। উমাপ্রসাদ তার জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠান। ছ' মাস পাঠানো হয় নি। যাতে তাড়াতাড়ি পাঠান সেজন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

চিঠিটা খামের ভেতর পুরতে পুরতে সুদীপা স্থির করে ফেলেছিল, যেভাবেই হোক কার্সিয়াঙে যাবে।

রাত্রে উমাপ্রসাদ অফিস থেকে ফিরলে চাকরকে দিয়ে চিঠিটা তাঁর কাছে

পাঠিয়ে দিয়েছিল সুদীপা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবা তাঁর ঘরে চলে এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'এই চিঠিটা খুলল কে?'

সুদীপা বলেছিল, 'আমি।'

রুক্ষ গলায় উমাপ্রসাদ বলেছেন, 'কেন খুললে?'

'ভুল করে খুলে ফেলেছি।'

'ভুল করেও অন্যের চিঠি খোলা উচিত নয়। দ্যাটস ব্যাড। পড়েছ?'

আগে আর কখনও যা করে নি, সেদিন তা-ই করেছিল সুদীপা। মিথ্যাই বলেছিল, সে, 'না।'

উমাপ্রসাদ হয়ত বিশ্বাস করেছিলেন, হয়ত করেন নি। স্থির চোখে মেয়ের দিকে খনিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে গিয়েছিলেন।

কার্সিয়াঙে মাদার মেরি অরফ্যানেজে যাবার সুযোগটা এসে গিয়েছিল হঠাৎ। ঐ চিঠিটা আসার মাসখানেক বাদেই।

শিলিগুড়িতে তখন তাদের কনসার্ন একটা বিরাট কোল্ড স্টোরেজ বানাচ্ছে। কীভাবে সাইটে গিয়ে কাজকর্ম তদারক করতে হয় সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্য সুদীপাকে পাঠানো হল। সঙ্গে নিল একজনু জুনিয়র আর্কিটেক্ট আর একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ারকে। ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল হোটেলে। সবার জন্যই আলাদা আলাদা এয়ার-কুলার বসানো ঘর।

দিন দুয়েক সাইটে ঘুরে কাজকর্ম দেখল সুদীপা। তারপর তৃতীয় দিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কার্সিয়াঙে চলে এসেছিল। ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ঠিক হয়েছিল, সারা দিন কার্সিয়াঙে তাকে থাকতে হবে। তারপর সন্ধ্যেবেলা শিলিগুড়ির হোটেলে ফিরিয়ে আনবে।

কার্সিয়াঙ শহর থেকে একটু দূরে একটা উঁচু টিলার মাথায় মাদার মেরি অরফ্যানেজটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয় নি। জায়গাটা চমৎকার। আশেপাশে লোকজনের ভিড় নেই। চারধারে পাহাড়, ছোটখাটো জঙ্গল। ওখানে শুধু নির্জনতা আর অগাধ শান্তি।

অরফ্যানেজের সর্বেসর্বা ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক অসাধারণ মানুষ। সত্তরের মতো বয়স। টান-টান চেহারা। চুলদাড়ি ধবধবে। পরনে সাদা সারপ্লিস, পায়ে সাদা কেডস। চোখমুখ স্নেহের রসে যেন ভাসো ভাসো। চমৎকার বাংলা এবং নেপালী বলতে পারেন। উত্তর বাংলার মদেসিয়া আর রাজবংসিদের ডায়ালেক্ট সম্ভবত তাদের চাইতেও ভালো বলেন।

অরফ্যানেজের একধারে ছোট চার্চ, তার গায়ে লাল রঙের একতলা ছোট বাড়িটায় ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক থাকেন। অনাথ আশ্রমে লোকেদের জিজ্ঞেস

করে করে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল সুদীপা। বলেছিল, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি ফাদার।'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বলেছিলেন, 'কী দরকার মা?'

মুখ নামিয়ে সুদীপা বলেছিল, 'আপনার অরফ্যানেজে দেবাশিস বলে একটি ছেলে আছে?'

'তোমার কথার উত্তর দেবার আগে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে।'

'বলুন।'

'তোমার পরিচয়টা এখনও আমার জানা হয় নি মা।'

'আমি সুদীপা—সুদীপা মিত্র। একজন আর্কিটেক্ট, কলকাতায় থাকি। একটা কনস্ট্রাকাশনের কাজে শিলিগুড়ি এসেছিলাম, সেখান থেকে এখানে এলাম।'

'দেবাশিসের কথা তুমি কী করে জানলে মা?'

'দয়া করে এই প্রশ্নটা করবেন না। আমার পক্ষে উত্তর দেবার অসুবিধা আছে।'

'বেশ—' বলে একটু কী ভেবে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বলেছিলেন, 'দেবাশিস এখানেই থাকে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল সুদীপা। তারপর আস্তে করে বলেছে, 'আমি ওকে একটু দেখতে চাই।'

'তা তো হয় না মা।'

'কেন?'

'অচেনা কারো সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেওয়া হয় না। বারণ আছে।'

'বারণ কেন?'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক সামান্য হেসে বলেছিলেন, 'এর উত্তর আমি দিতে পারব না। যিনি দেবাশিসকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছাই ঐরকম।'

আধফোটা গলায় সুদীপা বলেছিল, 'ও। কিন্তু—'

'কী?'

'অনেক আশা নিয়ে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি। ওর কাছে যাব না, ওর সঙ্গে কথাও বলব না। দূর থেকেও ওকে একটু দেখা যায় না?' মুখ তুলে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েছিল সুদীপা।

তার স্বরে এমন এক আকুলতা ছিল যাতে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক এবার আর সোজাসুজি না বলতে পারেন নি। তাঁর মুখে মুহূর্তের জন্য কিসের ছায়া পড়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, দূর থেকেই তাকে

দেখতে পাবে। অবশ্য—

'কী?'

'আমার পক্ষে এটা অন্যায় হচ্ছে। তবু আমি এটা করব। এসো—'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক সুদীপাকে সঙ্গে করে চার্চের পেছনদিকে চলে গিয়েছিলেন। ওখানে অরফ্যানেজের স্কুল আর খেলার মাঠ।

তখন টিফিন চলছে। প্রায় পাঁচ-ছ'শো ছেলে সবুজ মাঠে ছোটাছুটি করছিল। দূর থেকে ছ'সাত বছরের একটি ছেলেকে দেখিয়ে আস্তে করে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বলেছিলেন, 'ঐ বাচ্চাটা দেবাশিস।'

ফর্সা টুকটুকে চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল, বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখ দেবাশিসের। পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে ছিল সুদীপা।

এই সময় ঘণ্টা পড়েছিল। টিফিন শেষ। অন্য ছেলেদের সঙ্গে দুদ্দাড় দৌড়ে স্কুলের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল দেবাশিস। যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, তাকিয়েই থেকেছে সুদীপা। ক্রমশ তার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক কিন্তু আর কোনো দিকে তাকান নি। একদৃষ্টে দেবাশিসকেই লক্ষ্য করছিলেন। বলেছিলেন, 'চল মা।'

নিঃশব্দে তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছিল সুদীপা। যে জন্য এতদূর ছুটে আসা তা হয়ে গেছে। এখন আর তার কিছু বলার নেই।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক হঠাৎ বলেছেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব মা?'

ঝাপসা গলায় সুদীপা বলেছে, 'করুন।'

'এত দূর থেকে একটা অনাথ ছেলেকে দেখতে ছুটে এসেছিলে কেন?'

সুদীপা কিছু বলতে চেষ্টা করছিল কিন্তু ঠোঁট দুটো শুধু থরথর করে কেঁপেছে আর দু' চোখ জলে ভরে গেছে।

এক পলক তার দিকে তাকিয়ে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক ভারি কোমল বাংলায় বলেছেন, 'থাক মা, কিছু বলতে হবে না। যা জানার তা তো বোধহয় আমি জেনে গেছি।'

আরো খানিকটা হেঁটে ট্যাক্সির কাছে এসে ফাদার বলেছিলেন, 'একটা কথা মা।'

'বলুন।'

'তুমি যে এখানে এসেছিলে, কাউকে কখনো বলো না।'

'না, বলব না।'

'আমাকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আমিও বলব না। পৃথিবীতে কিছু কিছু মিথ্যে আছে যা অনেক সত্যের চাইতেও মহৎ, না কি বল?'

সেই ঋজু সমুন্নত বয়স্ক মানুষটিকে বড় ভালো লেগেছিল সুদীপার। নিচু হয়ে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল সে।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক চোখ বুজে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড। একটা কথা বলি মা, যখনই তোমার মনে কষ্ট হবে দেবাশিসকে দেখে যেও।'

গভীর কৃতজ্ঞ গলায় সুদীপা বলেছিল, 'আচ্ছা।'

এর পর থেকে প্রতি বছরই ঠাকুমা বা বাবাকে না জানিয়ে বছরে দু'তিন বার করে কার্সিয়াঙের অরফ্যানেজে গেছে সুদীপা। প্রথম প্রথম দূর থেকেই দেবাশিসকে দেখত সে। কবে যেন ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক নিজেই উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে দেবাশিসের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ওকে অ্যান্টি ডাকতে বলেছেন। ওখানে গেলে সুদীপা তার জন্য প্রচুর টফি লজেন্স চকোলেট ফুটবল বা খেলনা-টেলনা নিয়ে যেত। আর নিত ছবির বই, গল্পের বই, দেশবিদেশের স্ট্যাম্প।

ছেলেটার জন্য সুদীপার কেন যে এত টান, কখনও জানতে চান নি ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক। সেও নিজের থেকে তাঁকে কিছু বলে নি।

এদিকে লণ্ডন থেকে তার ফেরার দু' বছরের মাথায় উমাপ্রসাদের প্রথম স্ট্রোক হয়ে গেল, তার ছ' মাস পরে আবার একটা স্ট্রোক। পর পর দুটো করোনারী অ্যাটাকে কাজের জগৎ থেকে বাতিল হয়ে গেলেন তিনি। ডাক্তারের নির্দেশে শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম বন্ধ। কাজেই হাউসিং ফার্মের যাবতীয় দায়িত্ব এসে পড়ল সুদীপার ওপর।

উমাপ্রসাদের যেবার সেকেণ্ড অ্যাটাকটা হল, সে বছরই মৃন্ময় তাদের কোম্পানির একটা বাড়ি তৈরি করার কনট্রাক্ট দেয় সুদীপাকে। সেই সুত্রেই তার সঙ্গে সুদীপার আলাপ এবং ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা।

খুব সম্ভব আলাপ-টালাপের বছরখানেক বাদে মৃন্ময় একদিন বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী কথা আছে।'

মৃন্ময় কী বলতে চায় আবছাভাবে বুঝতে পেরেছিল সুদীপা। তবু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কথা?'

'এভাবে আর ভাল লাগছে না। এবার আমাদের একটা ডিসিশান নিতে হবে।'

'তুমি বিয়ের কথা বলছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

'ঠিক আছে।'

মৃন্ময়ের সঙ্গে তার মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোথাও কোনো গোপনতা ছিল না। এখন সে অল্পবয়সের কিশোরী নয়। বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘকাল বিদেশবাস তার বয়স যেন অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে।

হেমনলিনী আর উমাপ্রসাদকেও মৃন্ময়ের কথা জানিয়েছিল সুদীপা। শুধু তাই না, তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে আলাপ করে দু'জনেই খুশি। বাবা এবং ঠাকুমার ইচ্ছা, সুদীপার সঙ্গে মৃন্ময়ের বিয়েটা হোক। সেটা তাঁরা আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতেন।

মৃন্ময়ের দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাবটা যেদিন এল, হেমনলিনী আর উমাপ্রসাদকে জানিয়ে দিয়েছিল সুদীপা। তখন থেকে তাঁরা এ ব্যাপারে একরকম চাপই দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু সুদীপা মনঃস্থির করতে পারে নি। বহুদিন আগে, হয়ত পূর্বজন্মেই একটা নির্জন পোড়ো বাড়িতে কুৎসিত বিয়ের অনুষ্ঠান আর কার্সিয়াঙের অরফ্যানেজে একটা ছোট্ট ছেলের ফুলের মতো নিষ্পাপ মুখ তাকে আরো ক'টা বছর দ্বিধান্বিত করে রেখেছিল। এদিকে ঠাকুমা আর বাবার চাপ ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। তাঁরা চাইছিলেন বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকে যাক। একজনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। রোগ আরেক জনের আয়ুকে কেটে-ছেঁটে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কখন কার কী হবে, বলা যায় না। দু'জনেই বেঁচে থাকতে থাকতে সুদীপার বিয়েটা হয়ে যাক, এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য।

মৃন্ময় অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত এবং সংযত। সে কিন্তু আর একবারও বিয়ের কথা বলে নি। তার ব্যস্ততা নেই। সুদীপা কবে নিজের থেকে এগিয়ে আসবে, সেদিনের আশায় সে অপেক্ষা করে আছে।

শেষ পর্যন্ত সব দ্বিধা কাটিয়ে কাল সুদীপা ফোনে মৃন্ময়কে বলেছিল, 'কাল দুপুরে তোমার সময় হবে?'

মৃন্ময় বলেছিল, 'নিশ্চয়ই। তোমার জন্যে সকাল বিকেল মাঝরাত—যখন বলবে তখনই সময় করে নেব। বল কী হুকুম?'

'দুপুরে, ধরো বিটুইন ওয়ান অ্যাণ্ড টু, আমরা আলাদা কোথাও বসতে চাই। তুমি আর আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ থাকবে না।'

'ফাইন। এক কাজ করি বরং। পার্ক স্ট্রীটের কোন রেস্তোরাঁয় একটা টেবিল 'বুক' করে নিই। কোণের দিকে নিরিবিলিতে দিতে বলব। ওখানেই লাঞ্চটা সেরে নেব। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

'আমার আপত্তি নেই।'

এবার গলা নামিয়ে মৃন্ময় বলেছে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সুদীপা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই।'

'জানতে ইচ্ছা করছে হঠাৎ জরুরী তলব কেন?'

'অনেকদিন আগে তুমি একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলে। আমি ভাবার সময় নিয়েছিলাম। মনে পড়ে?'

'অফ কোর্স।'

'আমার ভাবা শেষ হয়েছে। কাল তোমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলব।'

'গ্র্যাণ্ড। আজ একটুও হিণ্ট-টিণ্ট দেবে না?'

'নো—'

'কাল দুপুর পর্যন্ত আমাকে সাসপেন্সের ভেতর ফেলে রাখবে? এক্সাইটমেন্টে আমি মরে যাব।'

'মরবে না। সাসপেন্স আর এক্সাইমেন্টটা থাক।' বলেই লাইন কেটে দিয়েছিল সুদীপা।

নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা ঠাকুমা আর বাবাকেও জানিয়ে দিয়েছিল সুদীপা। তাঁরাও খুব খুশি হয়েছেন।

কিন্তু আজ মৃন্ময়ের সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটে লাঞ্চ খেতে যাবার আগে সেই মারাত্মক বেনামী চিঠিটা এল। চারদিকে ফেস্টিভ মুড অর্থাৎ আবহাওয়া যখন তৈরি হতে যাচ্ছে তখনই ঝপ করে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। অদৃশ্য কোথাও, হয়ত নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই কোমল সিমফোনি শুরু হয়েছিল; হঠাৎ তার সুর কেটে গেল।

কতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ছিল খেয়াল নেই সুদীপার। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। বিছানার পাশেই একটা নিচু স্ট্যাণ্ডে টেলিফোনটা থাকে। চমকে সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে লিজার গলা ভেসে এল, 'মিস মিত্র কি বাড়ি এসেছেন।' তার স্বরে রীতিমত উদ্বেগ।

সুদীপা বলল, 'কি ব্যাপার লিজা? অফিসে কিছু গোলমাল-টোলমাল হয়েছে? এনিথিং রং?'

'নাথিং ম্যাডাম। লাঞ্চ সেরে আপনার অফিসে ফেরার কথা ছিল। না আসায় আমরা খুবই চিন্তায় পড়েছিলাম। তাই বাড়িতে ফোন করে খোঁজ নিলাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আপনার শরীর কি খারাপ হয়েছে?'

'না না, আমি ঠিক আছি। পারফেক্টলি অলরাইট। লাঞ্চের পর অফিসে আর ফিরতে ইচ্ছা করল না; সোজা বাড়ি চলে এলাম।' বলেই সুদীপার মনে হল কৈফিয়তটা খুব একটা জোরালো হয় নি। কখনও অফিসের কাজ-টাজ ফেলে সে বাড়ি চলে আসে না।

লিজা হয়ত কিছু বলত, আর আগেই সুদীপা ফের বলল, 'আর কিছু বলবে?'

লিজা বলল, 'রাহা সাহেব বলছিলেন, সাড়ে চারটের সময় কী একটা বিল্ডিং প্ল্যান ফাইনাল করার কথা আছে। সে সম্বন্ধে উনি জানতে চাইছেন—'

'মিস্টার রাহাকে বলে দাও, ও ব্যাপারে কাল অফিসে গিয়ে যা করার করব। এখন ছাড়ছি।'

'আচ্ছা। শুভ আফটারনুন ম্যাডাম।'

'গুড আফটারনুন।'

লিজার সঙ্গে কথা বলার পর আরো খানিকটা সময় কেটে গেছে। বাইরে বিকেলের রোদ আরো গাঢ় হয়েছে। বাগানে গাছের ছায়া আরো লম্বা হয়ে গেছে।

শরতের শেষ বেলায় আকাশ বড় মায়াবী। ঝকঝকে নীলাকাশে তুলোর স্তূপের মতো সাদা মেঘ। নরম সোনালী রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। আর আছে পাখি। পাখির ঝাঁক এধার থেকে ওধারে লক্ষ্যহীন ছুটে বেড়াচ্ছে।

বালিশে চিবুক রেখে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে ছিল সুদীপা। কিছুই ভালো লাগছে না তার।

হঠাৎ বাড়ির কাজের লোক মুনেশ্বর দৌড়ুতে দৌড়ুতে ঘরে এসে ঢুকল। রীতিমত উত্তেজিত এবং খুশি সে।

মুখ ফিরিয়ে সুদীপা বলল, 'কী হয়েছে?'

মুনেশ্বর বলল, 'নয়া সাব আয়া হ্যায়।'

নয়া সাব অর্থাৎ মৃন্ময়। সুদীপা চমকে উঠল। মৃন্ময় যে হুট করে বাড়ি চলে আসবে, এটা ভাবতে পারে নি সে। দ্রুত বিছানায় উঠে বসে বলল, 'সাহেব কোথায়?'

'বড়া সাবের কামরায়। বড়া সাব আপনাকে নিচে যেতে বললেন।'

বড়া সাব মানে উমাপ্রসাদ। বোঝা গেল, বাবা মৃন্ময়কে নিজের ঘরে

বসিয়েছেন।

মৃন্ময় ঐ বাড়িতে প্রায়ই আসে। নিয়মিত যাতায়াতের জন্য তার মধ্যে কোনো রকম আড়ষ্টতা নেই। তা ছাড়া তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক হতে যাচ্ছে। হেমনলিনী এবং উমাপ্রসাদ তাকে খুবই পছন্দ করেন। হেমনলিনী তো ভাবী নাতজামাইয়ের সঙ্গে দস্তুরমতো ঠাট্টা-টাট্টা করেন। তাঁর কৌতুক এবং মজার মধ্যে সেক্সের গন্ধ মেশানো থাকে।

এক মুহূর্ত কী ভেবে সুদীপা বলল, 'নয়া সাবকে এখানে আসতে বল।'

'জী—' মুনেশ্বর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগল।

মৃন্ময় আগেও সুদীপার এই বেডরুমে কয়েক বার এসেছে। আজও এলে বাবা বা ঠাকুমা খারাপ কিছু ভাববেন না। এখানে তাকে ডাকিয়ে আনার জন্য কারণও আছে। মৃন্ময়ের সঙ্গে তার কিছু খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার। সেখানে অন্য কেউ, বিশেষ করে উমাপ্রসাদ থাকলে খুবই অসুবিধা হবে।

পাঁচ মিনিটও পার হয় নি, মৃন্ময় ওপরে উঠে এল। সুদীপা সামনের সোফাটা দেখিয়ে বলল, 'বোসো।'

মৃন্ময় বলল, 'আমি এসে হয়ত তোমাকে ডিসটার্ব করলাম। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি যেভাবে রেস্তোরাঁ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলে, তাতে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছি।'

মৃন্ময়ের চোখে-মুখে, কণ্ঠস্বরে গভীর উদ্বেগ। সেটা যে লোক দেখানো নয়, বরং খুবই আন্তরিক, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুদীপা আবেগহীন গলায় বলল, 'ওভাবে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসা উচিত হয় নি। আই অ্যাম সরি। কিছু মনে করো না।'

'না—না, মনে করি না। আমার জন্য তোমার খাওয়াও নিশ্চয়ই হয় নি।'

'ও ঠিক আছে।'

এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুদীপা। বলল, 'আমি একটা ক্রিমিন্যাল।'

মৃন্ময় বলল, 'ও ব্যাপারটা মাথা থেকে বার করে দাও তো। যত ভাববে ততই মন খারাপ হবে।'

একটু চুপ। তারপর সুদীপা বলল, 'তুমি এসেছ, খুব ভাল হয়েছে। মনে মনে তাই বোধহয় চাইছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বল।'

'তার আগে কিছু খেয়ে নাও। আমি আনিয়ে দিচ্ছি।'

মৃন্ময় বলল, 'প্লীজ কিছু আনিও না। বিকেলে খেলে শরীর খারাপ হবে। একটু কফি পেলে অবশ্য ভালো হতো।'

মুনেশ্বরকে দিয়ে দু'কাপ কফি আনালো সুদীপা।

হাল্কা চুমুক দিয়ে মৃন্ময় বলল, 'এবার বলো।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না সুদীপা। মুখ নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। বোঝা যায়, তার মধ্যে অদ্ভুত এক যুদ্ধ চলছে। এক সময় সে যেন মনঃস্থির করে ফেলে। চোখ তুলে বলে, 'আজ যা বলার জন্যে তোমার সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটে গিয়েছিলাম, সে ব্যাপারে আমাকে আরেকটু ভাবতে হবে।'

মৃন্ময় বিন্দুমাত্র অস্থিরতা দেখায় না। সে যেন এই রকমই কিছু আশা করেছিল। খুব শান্ত গলায় বলে, 'তুমি কি নিজের ডিসিসন পাল্টাতে চাও?' বলে স্থির চোখে সুদীপার দিকে তাকায়।

'এই মুহূর্তে সে ব্যাপারে কিছু ভাবি না। তবে—'

'তবে কী?'

'আমার জীবনের একটা দিকের কথা তুমি জানো। কিন্তু আরো একটা দিক আছে যেটা তোমার কাছে টোটালি ডার্ক। অনেক বার তোমাকে বলতে চেষ্টা করেছি, পারি নি।'

মৃন্ময় সামান্য হাসল। বলল, 'এতদিন যখন বল নি তখন আর বলে কী হবে? আমার কাছে দুটোই টেন্স—প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড ফিউচার। পাস্ট নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

'তুমি জানো না, আমার লাইফে কত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেছে! অতীতের স্মৃতি আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার।'

'ফরগেট দ্যাট চ্যাপ্টার। তোমাকে যতটুকু জানি তাতেই আমি হ্যাপি। তার বেশি আর কিছু জানার দরকার নেই।'

'কিন্তু জানাতে না পারলে আমি একেবারেই স্বস্তি পাচ্ছি না। নইলে মনে হবে আমি তোমাকে বিট্রে করছি, ঠকাচ্ছি। প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা—এ সবের ওপর কোনো রিলেশান গড়ে উঠলে অ্যাল্টিমেটলি তা ভালো হয় না।

মৃন্ময় বলল, 'একটা মেয়ের লাইফে কী অ্যাকসিডেন্ট আর ঘটতে পারে? কম বয়সে হয়ত অন্য কারো সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করেছিলে—আই মীন কাফ লাভ। হয়ত বিয়ে হয়েছিল, ডিভোর্স হয়ে গেছে। নইলে কিডন্যাপড হয়েছিল। এত বড় সিটিতে যেখানে আট মিলিয়ানের ওপর পপুলেশন, হাজার রকম কারেক্টারের মানুষ, সেখানে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।'

তার শেষ কথাটা শুনতে শুনতে চমকে উঠল সুদীপা।

মৃন্ময় থামে নি, 'এ সব ব্যাপারে আমার কোনরকম প্রেজুডিস নেই।

তোমাকে যেটুকু জেনেছি বা দেখেছি তাতে আমি হ্যাপি। এর মধ্যে ঠাকানো বা বিশ্বাসঘাতকার প্রশ্নই আসে না।'

সুদীপা কী বলবে বুঝতে পারল না।

মৃন্ময় আবার বলল, 'নতুন করে ভাবার কথা বললে না?'

সুদীপা আস্তে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

মৃন্ময় বলল, 'বেশ তো, ভাবো। যতদিন না মন স্থির করতে পারছ, আমি অপেক্ষা করব।'

সুদীপা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মৃন্ময় বলে উঠল, 'একটা খুব আর্জেন্ট কাজ ফেলে এসেছি, আজ আর বসতে পারছি না। বী স্টেডি, বী লাইভলি অ্যাজ এভার। মাথা থেকে আজে-বাজে চিন্তাগুলো বার করে দাও। রাত্তিরে ফোন করব। এখন চলি।'

সুদীপা মৃন্ময়ের সঙ্গে নিচে 'লনে'র মাঝখানে নুড়ির রাস্তা পর্যন্ত এল। সেখানে তার নতুন মডেলের ঝকঝকে জাপানী গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

।। সাত ।।

মৃন্ময়ের মধ্যে মিডল ক্লাসের ভ্যাদভেদে কোনো ব্যাপার নেই। না কোন প্যান প্যানে সেন্টিমেন্ট, না কোনো পুরনো বাজে সংস্কার। বেশ কয়েক বার গোটা পৃথিবী ঘুরে এসেছে সে। নিজস্ব বিজনেসের কাজে এখনও বছরে দু'একবার ইওরোপ-আমেরিকায় যেতে হয়। নানা দেশের নান মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনযাত্রার প্যাটার্ন লক্ষ্য করে একটা বিরাট লাভ হয়েছে তার। বাঙালীসুলভ ক্ষুদ্রতা আর সংস্কারের দেওয়ালগুলো ভেঙে ফেলতে পেরেছে।

মনের দিক থেকে মৃন্ময় খুবই বলিষ্ঠ মানুষ। শুধু তাই না, তাজা টগবগে আধুনিক এবং উদারও।

যদিও কাল বিকেলে এসে মৃন্ময় তাকে পুরনো ব্যাপার নিয়ে ভাবতে বারণ করে গেছে, তবু সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গ ছাড়ে নি। সর্বক্ষণ তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে। মৃন্ময় কাল কিছুতেই শুনতে চাইল না। যত বার বলতে চেয়েছে, তত বারই সে তাকে থামিয়ে দিয়েছে। এখন না পারলেও পরে মৃন্ময়কে বলতেই হবে, নইলে অদ্ভুত এক পাপবোধ সুদীপাকে কিছুতেই স্থির হতে দিচ্ছে না।

কাল রাত্তিরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিল সুদীপা। আজ উঠতে দেরি হয়ে গেল। তবে ভালো ঘুম হওয়ার জন্যে শরীরটা ঝরঝরে লাগছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই বাইরে তাকাল সুদীপা। বেশ রোদ উঠে গেছে। মনে পড়ল, আজ অফিসে পৌঁছুবার আগে একবার সাদার্ন অ্যাভেনিউতে যেতে হবে। তাদের নবজীবন হাউসিং কোম্পানি একটা হাই-রাইজ বিল্ডিং তৈরি করছে। 'পাইল' ড্রাইভিং হয়ে গেছে। এখন 'কলাম' বার করে ওপরের দিকের কাজ শুরু হয়েছে। সব ঠিকঠাক চলছে কিনা, সাইটে গিয়ে দেখতে হবে।

কাল পুরনো স্মৃতি যেভাবে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আজ সে ভাবটা আর নেই। মনের ভার এবং অস্থিরতা অনেকটা কেটে গেছে যেন। বাবা এবং ঠাকুমা ঠিকই বলেছেন, ভেঙে পড়লে চলবে না। যাই ঘটুক, সে মুখোমুখি দাঁড়াবে। তা ছাড়া এতবড় হাউসিং কনসার্নের সব দায়দায়িত্ব তার। প্রায় শ'খানেক এমপ্লয়ীর একশটা ফ্যামিলি তার ওপর নির্ভর করে আছে। তা ছাড়া সাইটে যারা বাড়ি তৈরি করে, এইরকম আরো কয়েকশ ক্যাজুয়েল ওয়ার্কার রয়েছে। সেই সঙ্গে অসুস্থ বাবা, বয়স্কা ঠাকুমা। সুদীপা যদি মুষড়ে পড়ে, যদি সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, এতগুলো মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়বে।

যদিও বেলা হয়েছে, মুনেশ্বর বেড-টিই দিয়ে গেল। এক চুমুকে কাপটা শেষ করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল সুদীপা।

আরো আধ ঘণ্টা বাদে ব্রেকফাস্ট সেরে সোজা সাদার্ন অ্যাভেনিউতে চলে এল সে। কাল তার পরনে ছিল শাড়ি, দামী গয়না-টয়না। আজ চেনা পোশাকেই তাকে দেখা যাচ্ছে—সেই জীনস, সেই শার্ট, পায়ে পুরু সোলের জুতো। বাঁ হাতে চওড়া স্টীল ব্যাণ্ডে ইলেকট্রনিক ঘড়ি ছাড়া অন্য কোনও গয়না নেই। কাল সিল্কের শাড়িতে, হীরের গয়নায় সে ছিল এক কমনীয় লাজুক যুবতী। কিন্তু আজ এক টপ 'বস'—কড়া, গম্ভীর, ব্যক্তিত্বময়ী।

ড্রাইভার গাড়িটা রাস্তার একধারে পার্ক করতেই নেমে সোজা সাইটে চলে গেল সুদীপা।

এধারে ওধারে লোহালক্কড়, সিমেন্টর বস্তা, বালি, স্টোন চীপস ইত্যাদি ডাঁই হয়ে আছে। 'কলাম' বার করে একতলার ছাদ ঢালাইয়ের জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশটা মজুর এখন পেরেক ঠুকে ঠুকে তক্তা বসাচ্ছে। একধারে দাঁড়িয়ে একজন জুনিয়র সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, নাম বিজন বসু, কাজ তদারক করে যাচ্ছে।

সুদীপা জানে, তার ফার্মের ওয়ার্কাররা কেউ ফাঁকি দেয় না। তারা যেমন কোম্পানির কথা ভাবে, সেও তেমনি তাদের ইন্টারেস্টের দিকটা দ্যাখে।

কোনো কাজ যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর ওয়ার্কররা কমপ্লীট করতে পারে, মাইনের ওপরও সে তাদের ভালো ইনসেন্টিভ দেয়। যদি শিডিউল্ড টাইমের আগেই শেষ হয়ে যায়, সুদীপা এই বোনাসটা দ্বিগুণ তিনগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

সুদীপার একটা হিসেব আছে। তার মতে প্রোফিউজলি পে করলে অর্থাৎ পয়সা বেশি দিলে এবং ব্যবহার ভালো করলে তার রেজাল্ট ভালো হয়। ওয়ার্কাররা খুশি থাকে, কাজটাও দ্রুত শেষ হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা আগে কাজ শেষ হলে লাভ অনেক দিক থেকেই। ওয়ার্কারদের মাইনে বেশি দিন টানতে হয় না। বিল্ডিং মেটিরিয়ালের দাম ফী মাসেই লাফিয়ে ল্যাফিয়ে বাড়ছে। যত দেরি হবে, কনস্ট্রাকশনের খরচ ততই বেড়ে যাবে। তা ছাড়া বেশি ইন্টারেস্টে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে বাড়ি করে সুদীপারা। ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বিলের টাকা আদায় হলে শোধ দেওয়া হয়। কাজ যত দেরি হবে, ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্টও ততই বেড়ে যাবে। কাজেই ওয়ার্কারদের বাড়তি কিছু দেওয়াটা সব দিক থেকেই লাভজনক।

সাইটে সুদীপার না গেলেও চলে। তবু যে যায় তার কারণ, ওয়ার্কারদের এক্সট্রা উৎসাহ দেওয়া। তা ছাড়া কাজ করতে করতে মেটিরিয়ালের অভাবে বা অন্য কোনো কারণে হঠাৎ অসুবিধা হতে পারে। সুদীপা তক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দেয়। তাতে কাজ আটকে থাকে না।

সুদীপাকে দেখে বিজন দৌড়ে এল। পঁচিশ-ছাব্বিশের মতো বয়স। ধারাল চেহারা। ছেলেটা দারুণ স্মার্ট আর ঝকঝকে। তেমনি কাজেরও। সুদীপা তাকে খুবই পছন্দ করে।

বিজন বলল, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম।'

সুদীপা বলল, 'গুড মর্নিং।'

এধার ওধার থেকে ওয়ার্কাররা বলতে লাগল, 'নমস্তে মেমসাব' বা নমস্তে দিদিজী' বা 'নমস্তে মাঈজী—'

হাত তুলে তুলে সবাইকে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বিজনের দিকে ফিরল সুদীপা। বলল, 'কাজ কী রকম চলছে?'

বিজন বলল, 'ভেরি স্মুদ।'

'কোনো প্রবলেম?'

'না।'

'সিমেন্ট, লোহা, বালি—সব মেটিরিয়াল স্টোর করা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এদিকটায় ভালো করে লক্ষ্য রাখবে। কোনো মেটিরিয়াল ফুরোবার সাত দিন আগেই জানিয়ে দেবে। জিনিসের জন্যে কাজ যেন না আটকায়।'

'আমি লক্ষ্য রেখেছি।'

'গুড।'

বাঁশের ভারায় উঠে কিছুক্ষণ তক্তা মারা দেখল সুদীপা। তারপর সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল। বিজন তার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এল।

অফিসে যখন সুদীপা পৌঁছল, দশটা বেজে গেছে। এখন সব ডিপার্টমেন্টেই পুরোদমে কাজ চলছে।

নিজের চেম্বারে ঢুকতেই ওধার থেকে লিজা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'গুড মর্নিং—'

'গুড মর্নিং—' নিজের চেয়ারে বসতে বসতে সুদীপা বলল, 'কাল বিকেলে যে চিঠিগুলো এসেছে দেখি।'

লিজা একদৃষ্টে সুদীপার দিকে তাকিয়ে ছিল আর তুলনামূলকভাবে কালকের কথা ভাবছিল। কাল এই মহিলাই কি ঐ রকম ভেঙেচুরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন? কালকের সুদীপা মিত্রের সঙ্গে আজকের এই সুদীপা মিত্রের কোনো মিল নেই। এই সুদীপা রীয়াল অফিস বস—গম্ভীর, সীরিয়াস্ এবং প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না। লিজা ব্যস্তভাবে বলল, 'ইয়েস ম্যাডাম—' বলেই চিঠিপত্রের ফাইল নিয়ে সুদীপার টেবিলের কাছে চলে এল।

সুদীপা চিঠির পর চিঠি দেখে যাচ্ছে। লিজা পলকহীন তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। এক সময় হঠাৎ সে বলল, 'ম্যাডাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সুদীপা বলল, 'কী?'

'আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো?'

ফাইল থেকে চোখ না তুলে সুদীপা বলল, 'আই অ্যাম অলরাইট। কালও কিছু হয় নি।'

লিজা বলল, 'কিন্তু ম্যাডাম—'

পুরু সেলের চশমার ভেতর দিয়ে এক পলক তাকিয়েই আবার চিঠি দেখতে লাগল সুদীপা। আবেগহীন ভারী গলায় বলল, 'দিস ইজ অফিস। পার্সোনাল ব্যাপারে খোঁজখবর নিলে দামী সময় নষ্ট হয়।' বলেই মনে হল, এতটা রূঢ় না হলেই চলত কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই।

লিজা চমকে উঠল। বলল, 'আই অ্যাম স্যরি ম্যাডাম।'

সুদীপা উত্তর দিল না। কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের ভেতর চিঠিগুলো সম্বন্ধে

লিজাকে প্রায়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফার্স্ট আওয়ার্সে অফিসে আমার কোনো কনফারেন্স আছে?'

রোজকার মতো আজও চিঠির ফাইল আর সেই ছোট ডায়েরি নিয়ে এসেছিল লিজা। ডায়েরিটা সুদীপার প্রতিদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্মের অ্যাডভান্স নোট থাকে। পাতা উল্টে লিজা বলল, 'সাড়ে এগারটায় একটা কনফারেন্স আছে।'

'কিসের?'

'বাড়ি তৈরির ব্যাপারে আমাদের যে সব টেণ্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আর্কিটেক্ট আর ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে আজ আপনার আলোচনা আছে।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন নিজের জায়গায় যাও।'

লিজা তার টেবিলের দিকে চলে গেল।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারটায় সুদীপা নিজের চেয়ার থেকে বেরিয়ে সোজা কনফারেন্স রুমের দিকে গেল।

তারপর পাঁচ মিনিটও কাটল না, ফোন বেজে উঠল। সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে কালকের সেই চাপা, মোটা, ঈষৎ ভারী গলা ভেসে আসে, 'চ্যাটার্জী বলছি।'

লিজা দ্রুত দরজার দিকে তাকায়। তারপর খুব নিচু গলায় বলে, 'এখন ফোন করলেন। ভেরি রিস্কি।'

'তোমার 'বস' কি ঘরে আছেন?'

'না। কনফারেন্স রুমে গেছেন।'

'ফাইন। মন খুলে একটু কথা বলা যাক।'

'না স্যার, এখন ওটা ঠিক হবে না। মিস মিত্র যে কোন মোমেন্টে ফিরে আসতে পারেন। লাইনটা ছেড়ে দিন। পরে আমিই আপনাকে ফোন করব।'

'ঠিক আছে, বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাবো না। শুধু দু'একটা কথা জানতে চাই।'

'বলুন।'

'কাল তোমার 'বস' তে আপসেট ছিলেন। আজ তাঁকে কী রকম দেখছ?'

'ভেরি স্টেডি। কালকের সেই মুষড়েপড়া ভাবটা নেই। ভীষণ গম্ভীর। সীরিয়াসলি কাজকর্ম করছেন।'

'আই সী। চিঠিটার ব্যাপারে আজ কিছু বললেন?'

'না।'

'কাল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মৃন্ময় দত্তর সঙ্গে তোমার 'বস' যে লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলেন, তারপর কী হল?'

'জানি না।'

'একটু খোঁজখবর নিও।'

'আচ্ছা।'

'এখন এই পর্যন্তই থাক। পরে আবার কথা হবে।'

লিজা ফোন নামিয়ে রাখল।

।। আট ।।

সুদীপা কনফারেন্স রুমে এসে দেখল, সীনিয়র আর্কিটেক্ট নিরঞ্জন রাহা, দুই সিভিল ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়ব্রত সান্যাল আর সব্যসাচী তরফদার বসে আছেন।

নিরঞ্জন এবং প্রিয়ব্রতর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। প্রায় ষাটের কাছাকাছি। উমাপ্রসাদের আমল থেকেই ওঁরা এই কনসার্নে আছেন। সব্যসাচী অবশ্য পরে এসেছেন। বয়সও তাঁর অনেক কম। বড় জোর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। অন্য একটা ফার্ম থেকে তাঁকে বেশি মাইনে দিয়ে সুদীপাই নিয়ে এসেছে।

নিরঞ্জন এবং প্রিয়ব্রতকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে সুদীপা; কাকা বলে। কোম্পানির সব ব্যাপারেই তাঁদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

সুদীপা তার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে বলল, 'প্রিয়কাকা, নিরকাকা, আজ কোন কোন বাড়ির টেণ্ডার নিয়ে ডিসকাসন হবে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'চৌরঙ্গীতে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির হেড কোয়ার্টার বিল্ডিংটা নিয়েই মেইনলি কথা হবে। আজই সব ফাইনাল করে পাইল ড্রাইভিং-এর ব্যবস্থা করে ফেলব। ওরা আড়াই বছর সময় দিয়েছে। নেক্সট মান্থে কাজ শুরু করে দিতেই হবে।'

এবার মনে পড়ে গেল সুদীপার। বলল, 'এ নিয়ে লাস্ট উইকে ডিটেলে আলোচনা হয়ে গেছে। কর্পোরেশন প্ল্যান পাসও করে দিয়েছে।'

'তবু কাজ শুরু করার আগে ব্লু প্রিন্টটা আরেক বার দেখ। লাস্ট মোমেন্টে যদি কোনো গোলমাল ধরা পড়ে।' বলে প্রিয়ব্রত প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর বিরাট হাইরাইজ বিল্ডিং-এর বাইরের এবং ভেতরের নকশা সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

এই নকশা, ব্লু প্রিন্ট, সবই সুদীপার জন্য। জটিল নকশাগুলোর কোথায় কী আছে, চোখ বুজে ডিটেলে বলে দিতে পারে সে। আসলে এই হাই-রাইজ

বিল্ডিংয়ের পুরো প্ল্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সীনিয়র আর্কিটেক্ট নিরঞ্জন রাহাকে। দু'জন জুনিয়র আর্কিটেক্ট সহকারী হিসেবে তাঁকে সাহায্য করেছে। সুদীপাকেও তার অন্যান্য কাজ এবং দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে এ ব্যাপারে হাত লাগাতে হয়েছে। তার সাজেশন অনুযায়ী নিরঞ্জন রাহা নকশায় অনেক কিছু অদলবদলও করেছেন।

টেবিলের উপর ঝুঁকে দ্রুত ব্লু প্রিন্টগুলো আরো একবার দেখে নিল সুদীপা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে।'

নিরঞ্জন নকশাগুলো ভাঁজ করে বিরাট একটা ফাইলে পুরে ফেললেন। আর সব্যসাচী কিছু কাগজপত্র বার করে সুদীপার সামনে রাখলেন।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কী এগুলো?'

সব্যসাচী বললেন, 'টেণ্ডার। ঐ বাড়িটা তৈরির ব্যাপারে পাইল ড্রাইভ করার জন্য আমরা মাসখানেক আগে যে অ্যাডভার্টাইজেমেন্ট দিয়েছিলাম, তার রেসপন্সে আটটা কোম্পানি টেণ্ডার দিয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

'নেক্সট উইকে কনস্ট্রাকশন শুরু করতে হলে আজই টেণ্ডার ফাইনাল করে ফেলতে হবে।'

মিনিট পনের-কুড়ি আলোচনা করে ওরা একটা টেণ্ডার ফাইনাল করে ফেলল। সুদীপা বলল, তা হলে 'প্র্যাট, মিটার অ্যাণ্ড আসোসিয়েটস'-কে আমাদের ডিসিসন জানিয়ে অফিসিয়াল চিঠি পাঠিয়ে দিন।'

সব্যসাচী বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'এই বাড়িটা ছাড়া আর কোনো ব্যাপার আছে?'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'হ্যাঁ।' একটা ফাইল খুলে কিছু কাগজপত্র বার করে বলতে লাগলেন, রঞ্জু, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, 'ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কনসার্ন' বলে একটা পার্টি আমাদের দিয়ে বাড়ি বানাতে চায়।' খুব ছেলেবেলা থেকে সুদীপাকে দেখেছে প্রিয়ব্রতরা। ওঁরা তাকে উমাপ্রসাদের মতো রঞ্জু বলেই ডাকেন।

সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে।'

'ওদের একটা শর্ত ছিল। বাড়ির ফ্রন্ট ভিউটা কী রকম হবে, ওরা জানিয়ে দেবে। সেই অনুযায়ী নকশা বানাতে হবে। বিল্ডিং কনস্ট্রাকাশনের সময় ম্যাক্সিমাম এক বছর।'

'আমরা তো রাজী হয়েছিলাম। পার্টিকে তো জানিয়ে দেওয়া হয় নি?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু ওঁরা তো এখনও ফ্রন্ট ভিউর স্কেচ পাঠায় নি।'

'কাল পাঠিয়েছে। এই যে—' বলে প্রিয়ব্রত বড় মাপের চৌকো একটা আর্ট পেপার সুদীপার হাতে দিলেন।

সেটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সুদীপা। স্কেচ পেন্সিলে আঁকা যে নকশাটা রয়েছে, সেটা হুবহু তাদের বাড়ির ফ্রন্ট ভিউর মতোই। তবে স্কেচ অনুযায়ী যদি বিল্ডিংটা করা যায়, সেটা হবে তাদের বাড়ির অন্তত তিনগুণ।

এই কনসার্নের ছোটবড় সব এমপ্লয়ীই সুদীপাদের বাড়ি বহু বার গেছে। বাড়িটার সব কিছু তাদের মুখস্থ। প্রিয়ব্রত বললেন, 'সারপ্রাইজিং। একেবারে তোমাদের বাড়ির রিপ্লিকা। তবে অনেক বড়।'

সব্যসাচী বললেন, 'একেবারে কার্বন কপি বানালো কী করে কে জানে!'

নিরঞ্জন বললেন, 'আমার মনে হয়, রঞ্জুদের বাড়িটা ওরা দেখে থাকবে। দেখে এত পছন্দ হয়েছে যে ঐ রকম একটা বানিয়ে নিতে চায়।'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'সেটাই সম্ভব। রঞ্জুদের বাড়ির মতো ঐ রকম গথিক স্ট্রাকচারের চমৎকার বিল্ডিং কলকাতায় বেশি নেই।'

প্রিয়ব্রতর কথাই হয়ত ঠিক। খুবই যুক্তিসঙ্গত। তবু কোথায় যেন একটা খট্‌কা থেকে যাচ্ছে। আজকাল কেউ আর মোটা পিলার দিয়ে এই ধরনের বাড়ি করায় না। এতে জায়গা নষ্ট। এখন সেন্ট পারসেন্ট ক্ষেত্রেই জমি প্রায় না ছেড়ে ফ্রেম স্ট্রাকচারে 'কলামে' বসিয়ে বসিয়ে বাড়ি তোলা হয়। ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ ল্যান্ডই এখন উদ্দেশ্য—বিশেষ করে বড় বড় সিটিতে। জমি না ছেড়ে গা ঘেঁষাঘেষি করে উঁচু উঁচু আকাশছোঁয়া বাড়ি উঠছে। ইদানীং স্কাই ইজ দা লিমিট। বাগান নেই, ঘাস নেই, ফাঁকা প্লেস নেই। শহর এখন দমবন্ধ, বুকচাপা কংক্রীটের জঙ্গল। অবশ্য উপায়ও নেই। বিগ সিটি, বিশেষ করে কলকাতা বম্বে দিল্লীর মতো শহরগুলোতে জমির দাম হু-হু করে চড়ে যাচ্ছে। এখানে কেউ এক সেন্টিমিটার জায়গাও নষ্ট করতে চায় না, সবটুকুই লোহায় কংক্রীটে মুড়ে ফেলতে চায়।

কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কনসার্নের ব্যাপারটা অদ্ভুত। তারা প্রায় দেড় বিঘের মতো জমির বেশির ভাগটাই 'লন' এবং বাগানের জন্য রেখে বাকিটা গথিক স্ট্রাকচারের বাড়ি তুলতে চায়। ছ'বছরেরও বেশি নিজেদের ফার্মে বসছে সুদীপা। একরম বাড়ি সে একটাও তৈরি করে নি। কোনো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এ জাতীয় বাড়ি তৈরির প্রোপোজালও কখনও আসে নি।

নিরঞ্জন বলছিলেন, তাদের বাড়িটা দেখে 'ইন্টাররন্যাশনাল ইমপোর্ট-

এক্সপোর্ট কনসার্ন' ঐ রকম একটা বাড়ি করতে চাইছে। অসম্ভব কিছু নয়। তবু দুর্বোধ্য, একটু খট্‌কা থেকেই যাচ্ছে। কেন এই সংশয়, সে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না।

প্রিয়ব্রত বললেন, 'তা হলে এই বাড়িটা সম্পর্কে কী ডিসিসান নেওয়া হবে?'

সুদীপা বলল, 'আপনারা যা বলবেন তা-ই হবে।'

'ক্লায়েন্ট বেশ ভালোই। টার্মস অ্যান্ড কণ্ডিশানস ঠিকঠাক হয়ে গেলে ওরা কনস্টাকশ্রনের অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স করতে রাজী আছে। বাকি টাকাটা কাজের প্রোগেসের সঙ্গে ইনস্টলমেন্টে দিয়ে যাবে। বাড়িটা কমপ্লীট করে ক্লায়েন্টের হাতে যেদিন তুলে দেওয়া হবে, সেদিনই লাস্ট ইনস্টলমেন্ট পাওয়া যাবে।

'খুবই রিজনেবল টার্মস। আমাদের রাজী হওয়া উচিত।'

'তা হলে এ ব্যাপারে এগুতে পারি তো?'

'নিশ্চয়ই। দু'চার দিনের ভেতরেই পার্টির কাছে লোক পাঠান। ওদের আমাদের অফিসে ডাকান। এক বছরের মধ্যে বাড়ি শেষ করতে হলে খুব তাড়াতাড়ি কথাবার্তা বলে সব ফাইনাল করে ফেলুন।'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে সুদীপা বলল, 'প্রিয়কাকা, এই ক্লায়েন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ যেই আসুক, আমি যেন একটু জানতে পারি।'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'তুমি কি পার্সোনালি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

'হ্যাঁ। আপনারাও থাকবেন। একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। ওদের কাছে দু'একটা কথা জানতে চাই।'

'কী কথা।'

'কেন ওরা আমাদের বাড়ির মতো একটা বাড়ি বানাতে চায়?'

।। নয় ।।

পুজো এসে গেল। আর চার-পাঁচ দিন বাদেই ছুটি পড়ে যাবে।

সারা বছরের পনেরই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারি—এমনি পাঁচ-সাতটা দিন ছাড়া 'নবজীবন হাউসিং কনসার্নে' বিশেষ ছুটিছাটা থাকে না। তবে এই পুজোর সময়টা পুরো পনের দিন অফিস বন্ধ রাখে সুদীপা এবং কয়েক দিনের জন্য বেরিয়ে পড়ে৷ বাবা ও ঠাকুমাকে বলে, দার্জিলিং যাচ্ছে। আসলে সে যায় শিলিগুড়ি৷ওখানেই সব চাইতে দামী হোটেলে দিন কয়েক থাকে৷

আর রোজ দু'বেলা মাদার মেরি অরফ্যানেজে দেবাশিসকে দেখতে যায়।

বছরের অন্য সময়ও দু'তিনবার শিলিগুড়ি এসে দেবাশিসকে দেখে যায় সুদীপা। অফিসে এত কাজ যে তখন বেশি থাকতে পারে না। দু'একদিন থেকেই ফিরে যেতে হয়।

এবারও ছুটির আগে অনেক কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে। যে সব বাড়ির প্ল্যানে হাত দেওয়া হয়েছে সেগুলো শেষ করতে হবে। বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লায়ারদের অনেক পেমেন্ট করত হবে। ক্লায়েন্টদের কাছে এক কোটি টাকার মতো পড়ে আছে; সেগুলো আদায় করতে হবে। কর্পোরেশনে অনেকগুলো প্ল্যান জমা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো স্যাংশন করিয়ে নিতে হবে।

আজ অফিসে আসতেই অন্য সব দিনের মতো লিজা কালকের শেষ ডাকের চিঠি নিয়ে এল। ফাইলটা তার সামনে রেখে হাতে নোট-বুক আর প্যাড নিয়ে টেবিলের পাশে অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

সুদীপা লিজাকে বসতে বলে চিঠির পর চিঠি উল্টে নোট দিতে লাগল, আর লিজাও শটহ্যান্ডের প্যাডের পাতায় নোট নিতে লাগল।

দশ-বারোটা চিঠির পর একটা মুখ-আঁটা সাদা খাম দেখতে পেল সুদীপা। এনভেলপটা অবিকল সেদিনকার মতো। তার নাম-ঠিকানা তেমনই টাইপ-করা, এক কোণে 'স্ট্রিকলি পার্সোনাল' লেখা। বোঝা যায়, এটাও সেই অজানা স্কাউনড্রেলটার চিঠি। এক মুহূর্তের জন্য সুদীপার রক্তস্রোত থমকে গেল। তারপরই স্বাভাবিক বেগে চলতে শুরু করল।

পড়ল, দিন দশেক আগে এইরকম একটা খাম পাবার পর তার শরীরে এবং মনে দারুণ বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, নার্ভগুলো ছিঁড়ে পড়বে। সেই তুলনায় আজ সে অনেক বেশি স্টেডি, অনেক শান্ত এবং স্থির।

খামটা আস্তে আস্তে তুলে মুখ কেটে চিঠি বার করল সুদীপা। সেদিনকার মতোই টাইপ-করা দশ লাইনের চিঠি। এক পলক তাকিয়েই টের পাওয়া যায়, আগের চিঠিটা একই মেশিন থেকে টাইপ করা হয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে পড়তে লাগল।

বক্তব্য এই রকম। আপনাকে আগে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। আপনার সন্তান কোথায় আছে, ইংরেজি নিউজপেপারের 'পার্সোনাল কলামে' তা জানবার জন্য অনুরোধ করলাম। দশ দিন অপেক্ষা করলাম, কিন্তু আপনি কিছুই জানান নি। আরো একবার আপনাকে অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে

খবরটা জানান। চিরকাল আপনার কাছে এই কারণে কৃতজ্ঞ থাকব।

নিচে কারো নাম নেই।

আগের বারও নিউজপেপারের 'পার্সোনাল কলামে' দেবাশিসের নাম-ঠিকানা জানায় নি সুদীপা। এবারও ঠিক করল—জানাবে না। চিঠিটা ভাঁজ করে ফের খামে পুরতে পুরতে চোখের কোণ দিয়ে একবার লিজাকে দেখল। লিজার মুখে কোনরকম অভিব্যক্তি নেই; অনুগত ডিউটিফুল একজন এমপ্লয়ীর মতো সুদীপার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। নিচু চাপা গলায় সে বলল, 'এ রোগ, এ ব্ল্যাকমেলার' বলেই আবার ফাইলে ঝুঁকে চিঠি দেখতে দেখতে প্রয়োজনীয় নোট দিতে লাগল।

শেষ চিঠিটা যখন সুদীপা ফাইল থেকে তুলেছে, সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এমনিতে ফোন এলে লিজাই প্রথমে ধরে। অনেক সময় আজেবাজে 'কল' আসে, অবাঞ্ছিত লোকেরা চাকরি-বাকরির জন্য বা অন্য কারণে বিরক্ত করে। তাতে সময় নষ্ট, মেজাজ খারাপ। এ জাতীয় ফোন এলেই লিজা জানিয়ে দেয়—সুদীপা অফিসে নেই বা কনফারেন্সে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লিজাকে এই রকমই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে।

আজ কিন্তু ফোনটা নিজেই ধরল সুদীপা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফো অপারেটর অসীমা সেনের গলা ভেসে এল, ম্যাডাম, রাহা সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

সিনিয়র আর্কিটেক্ট নিরঞ্জন রাহা। ব্যস্তভাবে সুদীপা বলল, 'দাও।'

অসীমা লাইনটা দিল। ওধার থেকে নিরঞ্জন বললেন, 'রঞ্জু, ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট তরফ থেকে একজন এসেছেন।'

সুদীপা ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, 'কী ব্যাপারে বলুন তো নিরঞ্জন কাকা?'

'সেই যে ওঁরা তোমাদের বাড়ির মতো গথিক স্ট্রাকচারের একটা বাড়ি করাতে চান। তুমি বলেছিলে, ওঁদের কেউ এলে তুমি কথা বলবে।'

মনে পড়ে গেল। দারুণ আগ্রহের গলায় সুদীপা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভদ্রলোক কোথায়?'

'আমার ঘরে, তোমার ওখানে পাঠিয়ে দেব?'

এক মুহূর্ত ভেবে সুদীপা বলল, 'দশ মিনিটের ভেতর আমি আগনার ওখানে আসছি।'

'আচ্ছা'।

ফোন নামিয়ে শেষ চিঠিটা পড়ে ঝড়ের গতিতে ডিক্টেশন দিল সুদীপা।

তারপর সোজা নিরঞ্জন রাহার ঘরে চলে গেল।

এক পাশে একটা চেয়ারে মধ্য বয়সী নিরীহ ভালোমানুষ টাইপের এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। পরনে ধুতি আর টুইলের শার্ট। হাতে পুরনো ডিজাইনের 'ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচের' গোল ঘড়ি, পায়ে চপ্পল। দেখেই বোঝা যায়, ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কর্মচারী-টারী হবেন।

নিরঞ্জন দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। নমস্কার-টমস্কারের পর সুদীপা বলল, 'আসুন অবিনাশবাবু।' ভদ্রলোকের নাম অবিনাশ সাধুখাঁ।

তাঁকে নিয়ে সোজা কনফারেন্স রুমে চলে এল সুদীপা। অন্য কারো সামনে সে অবিনাশের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

দু'জনে মুখোমুখি বসল। সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের পক্ষ থেকে আসছেন?' এই প্রশ্নটা না করলেও চলত। তবু কথাবার্তা তো কোন একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে।

অবিনাশ খুবই বিনীতভাবে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি কাজ করবেন?'

'বিল সেকশানের বড়বাবু।'

কথায় কথায় সুদীপা জেনে নিল, ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট যে বাড়িটা করতে যাচ্ছে, তার অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছে অবিনাশ সাধুখাঁর ওপর। বাড়িটা যতদিন না হচ্ছে, অফিসের ডিউটি আপাতত বন্ধ করে এর পেছনে তাঁকে লেগে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সুদীপাদের সঙ্গে তিনিই যোগাযোগ রাখবেন।

সুদীপা বলল, 'একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে। মানে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে আর কি।'

অবিনাশ উৎসুক মুখে তাকালেন 'কী?'

'যে বাড়িটা করাতে চাইছেন, সেখানে কি আপনাদের অফিস উঠে যাবে?'

'আজ্ঞে না। ওটা আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ি হবে। অবশ্য তিনি কোম্পানির মালিকও।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের মালিকের নামটা জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। মিস্টার সাধন চ্যাটার্জী।'

সামান্য হতাশই হল সুদীপা। কিংবা তার উল্টোটাও হতে পারে। সে কি অন্য কোনো নাম আশা করেছিল। মুখ-চোখ দেখে পরিষ্কার কিছু বোঝা গেল না।

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বলল, 'আচ্ছা, যে নকশাটা আপনারা

পাঠিয়েছেন, সেটা কোত্থেকে পেলেন।'

অবিনাশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। দয়া করে—'

তাঁকে থামিয়ে সুদীপা বলল, 'মানে বলছিলাম বাড়ির যে স্কেচটা দিয়েছেন সেটা কি অন্য কোনো বাড়ি দেখে আঁকা হয়েছে?'

অবিনাশ কি ভেবে বললেন, 'আমি সেই রকমই শুনেছি। কোথায় যেন একটা বাড়ি দেখে চ্যাটার্জী সাহেবের খুব ভালো লেগে যায়। উনি ভাল আঁকতে পারেন। সেই বাড়িটার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পেন্সিলে স্কেচ করে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর আরো ভালো করে এঁকে আমাকে দিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।'

এর পর আর কিছু বলবার নেই। তবু সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কোন বাড়িটা দেখে আপনাদের চ্যাটার্জী সাহেব স্কেচ করেছিলেন, আপনি কি জানেন?'

'আজ্ঞে না ম্যাডাম।'

সুদীপা এবার বলল, 'অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলাম। কিছু মনে করবেন না প্লীজ। আবার দেখা হবে। আচ্ছা নমস্কার।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

অবিনাশও নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লেন।

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে নিজের চেম্বারের দরজা সামান্য একটু খুলেছে হঠাৎ লিজার গলা কানে এল সুদীপার। টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সে। লাইনের ওধারের গলা অবশ্য শোনা যাচ্ছে না, তা সম্ভবও না।

লিজা যা বলছে তা এইরকম। 'হ্যাঁ, আজকের চিঠিটা পেয়েছেন। ...রি-অ্যাকশান? নিশ্চয়ই ভালো না। মুখটা খুব স্টিফ দেখাচ্ছিল। আন্ডারটোনে গালাগালও দিলেন। ...কী বললেন? 'রোগ অ্যান্ড ব্ল্যাকমেলার।' ...সেদিনের মতো ভেঙে পড়েন নি। ...ইভনিং-এ আমাদের বাড়ি আসবেন?'

সুদীপার চেম্বারটা যদিও অফিসের এক কোণে, তবু এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড় পেতে নিজের পার্সোনাল সেক্রেটারির কথা শোনা অত্যন্ত অশোভন। তা ছাড়া এই প্যাসেজটা দিয়ে যে কোন মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে। তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তারা কিছু বলবে না ঠিকই, তবে নিশ্চয়ই কিছু ভাববে, সুদীপার পক্ষে তা ভয়ানক অস্বস্তিকর।

কার সঙ্গে কথা বলছে লিজা? তার সম্পর্কেই যে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ

নেই। বেনামী চিঠি পাঠিয়ে যে তার জীবন তোলপাড় করে দিয়েছে, নিশ্চয়ই সেই স্কাউনড্রেলটার সঙ্গে লিজার যোগাযোগ আছে। এমনও হতে পারে, লিজা তার এজেন্ট। এখানে চাকরি নিয়ে সুদীপার প্রতিটি মুভমেন্টের খবর সেই অদৃশ্য অজানা ব্ল্যাকমেলারটার কাছে পাঠাচ্ছে।

চেম্বারে ঢুকে সোজাসুজি এসব বিষয়ে লিজাকে কি প্রশ্ন করবে? পরক্ষণেই কিছু একটা মনে পড়তে ভাবল, না, এখন না। আপাতত ওকে কিছুদিন ওয়াচ করা যাক। লিজাকে দিয়েই অজানা সেই ধূর্ত বদমাশটাকে ধরতে হবে।

সুদীপা চেম্বারে আর ঢুকল না। সোজা টেলিফোন অপারেটর অসীমা সেনের ঘরে চলে গেল।

অসীমার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। গায়ের রঙ কালো। তবে ঘন পালকে ঘেরা চোখ, পাতলা নাক, ছোট্ট কপাল, কোঁচকানো কোঁচকানো চুল, তাকাবার স্নিগ্ধ ভঙ্গি—সব মিলিয়ে ভারি মিষ্টি চেহারা।

অসীমারা নানাভাবে সুদীপার কাছে কৃতজ্ঞ। বছর তিনেক আগে এন্টালি মার্কেটের পেছন দিকে কী একটা দরকারে গিয়েছিল সুদীপা। ফেরার সময় হঠাৎ রাস্তায় কান্নাকটির আওয়াজ শুনে গাড়ি থামাতে হয়েছিল। বস্তি টাইপের একটা বাড়ি থেকে গুণ্ডা ধরনের ক'টা লোক মালপত্র টেনে টেনে বার করে ফুটপাতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। দু'তিনটে ছেলেমেয়ে এবং এক বয়স্কা মহিলা সমানে কাঁদছেন। মধ্যবয়সী রোগা চেহারার এক ভদ্রলোক, মুখে খামচা খামচা দাড়ি—গুণ্ডাগুলোর হাতে-পায়ে ধরে কী বোঝাতে চেষ্টা করছেন আর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ছেন। উঠে আবার হাতজোড় করে তাদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। একধারে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবতী, তার চোখে-মুখে দারুণ আতঙ্ক। এই মেয়েটিই অসীমা।

গাড়ি থেকে নেমে অসীমার কাছেই গিয়েছিল সুদীপা। বলেছিল, 'কী হয়েছে?'

অসীমা জানিয়েছিল, 'ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওলা তাদের নামে কেস করেছিল। কেসে তারা হেরে গেছে। এখন গুণ্ডা লাগিয়ে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। আরো জানা গিয়েছিল, অসীমার বাবা সেই মধ্যবয়সী রোগা লোকটি যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন সেখানে দু'বছর লক-আউট চলছে। কলকাতায় তাদের আত্মীয়স্বজন আছে ঠিকই, তবে গরিব বলে সবাই এড়িয়ে যায়, কোনো রকম সম্পর্ক রাখতে চায় না। এই যে বাড়িওয়ালা বার করে দিল, এখন তারা কোথায় যাবে কী করবে, কিছু ঠিক নেই।'

কী যেন হয়ে গিয়েছিল সুদীপার। একটা লরীর ব্যবস্থা করে অসীমাদের

প্রথমে নিয়ে এসেছিল নিজেদের বাড়িতে। লনের পাশে ড্রাইভার-মালীদের জন্য অনেকগুলো ঘর আছে। তার কয়েকটা খালি ছিল। অসীমাদের সেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।

মাস ছয়েক ওখানেই ছিল অসীমারা। এর মধ্যে তাকে কাজ্‌কর্ম শিখিয়ে নিজেদের ফার্মে টেলিফোন অপারেটরের চাকরি দিয়েছে সুদীপা। এদিকে অনেক দিন লক-আউট থাকার পর অসীমার বাবার ফ্যাক্টরিও খুলে গিয়েছিল।

চাকরি-টাকরি পাবার পর একদিনও আর সুদীপাদের বাড়িতে থাকে নি অসীমারা, টালিগঞ্জের দিকে ছোটখাটো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় অসীমার মা আর বাবা সুদীপার দু'হাত ধরে গভীর কৃতজ্ঞ গলায় বলেছিলেন, 'মা, তোমার ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না।'

টেলিফোনের ঘরে সুদীপাকে দেখে অবাক হয়ে গেল অসীমা। তিন-চার বছর এখানে চাকরি করছে কিন্তু আগে কখনও সুদীপাকে এ ঘরে ঢুকতে দেখে নি। সে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, হাতে ইশারায় তাকে বসিয়ে দিল সুদীপা। নিচু গলায় বলল, 'এইমাত্র কি তুমি আমার চেম্বারে লিজাকে লাইন দিয়েছ?'

অসীমা বলল, 'হ্যাঁ, ম্যাডাম!' বাইরে সুদীপাকে সে 'দিদি' বলে, অফিসে ম্যাডাম। অফিসের ব্যাপারে যাবতীয় ডিসিপ্লিন সবাইকে সঠিকভাবে মেনে চলতে হয়।

'এখনও কি লিজা কথা বলছে?'

'না, ম্যাডাম। এইমাত্র লাইন ছেড়ে দিয়েছে।'

একটু ভেবে সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'অফিস ছুটির পর কী করছ?'

অসীমা বলল, 'বাড়ি চলে যাব।'

'তোমার অন্য কোনো কাজ নেই তো?'

'না।'

'ছুটির পর নিচে নেমে সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকো। আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'আচ্ছা।'

'ফিরতে দেরি হলে বাড়িতে নিশ্চয়ই ভাববেন। তোমার মাকে কি কোনভাবে খবর দেওয়া যায়?'

'বাড়িওলাদের টেলিফোন আছে। ওঁদের ফোন করলে মাকে জানিয়ে

দেবে।'

'দ্যাটস গুড।'

সুদীপা কোথায় নিয়ে যাবে, জানার ইচ্ছা হচ্ছিল অসীমার। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না।

সুদীপা আর দাঁড়াল না; সোজা নিজের চেম্বারে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্চ ব্রেক হয়ে গেল।

লাঞ্চের একটু আগে আগে বাড়ি গিয়ে সুদীপার শোফার তার দুপুরের খাবার এনে লিজার হাতে দিয়ে যায়। লিজা প্লেটে সাজিয়ে সুদীপাকে খেতে দেয়, নিজেও তার সঙ্গে খায়। দু'জনের মতো খাবার আসে বাড়ি থেকে।

অফিসে খাওয়ার জন্য একটা মাঝারি ডাইনিং রুম করিয়ে নিয়েছে সুদীপা। তবে সেখানে খায় না; নিজের চেম্বারে বসেই খেয়ে নেয়।

বাইরে 'এনগেজড' সাইন জ্বালিয়ে আজও খেতে বসলো সুদীপা, মুখোমুখি লিজা।

খেতে খেতে এলোমেলো কথা হচ্ছে, তবে ফোনের ব্যাপারে কিছুই বলল না সুদীপা। লিজার সম্পর্কে তার মনে যে সংশয় দেখা দিয়েছে, কোনভাবেই তা বুঝতে দিল না।

খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। লাঞ্চ টাইমে খুব জরুরী 'কল' না থাকলে লাইন দিতে বারণ করা আছে। বাঁ হাতে টেলিফোনটা তুলতেই মৃন্ময়ের গলা ভেসে এল, 'কী করছ?'

'সুদীপা বলল, 'লাঞ্চ—'

'কেন বল তো?'

'লাইটহাউসে একটা ভালো ছবি এসেছে। তোমার সময় থাকলে দেখা যেত।'

'আজ একটা কাজ পড়ে গেছে। অন্য দিন দেখা যেতে পারে।'

'ঠিক আছে।'

'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।'

'বল।'

'পুজোর ছুটি পড়তে তো আর দেরি নেই। তুমি, তোমার বাবা আর ঠাকুমা—আই মীন তোমাদের ফ্যামিলি রাজী থাকলে সাউথ ইন্ডিয়ায় যাওয়া যেত। কোভালাম বীচে হোটেল 'বুক' করব নাকি?'

আগেও পুজোর সময় কয়েক বার বাইরে বেড়াতে যাবার কথা বলেছে

মৃন্ময় কিন্তু সুদীপা যায় নি। সে বলল, 'না।'

হালকা ক্ষোভের গলায় মৃন্ময় বলল, 'প্রত্যেক বছর তোমাকে রিকোয়েস্ট করি। কখনও রাখো না। চলো না এবার, প্লিজ।'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, পুজোর ছুটিটা আমাকে একটা জায়গায় যেতে হয়। সেখানে ছাড়া আর কোথাও আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না।'

একটু চুপ করে থেকে মৃন্ময় বলল, 'একটা অনুরোধ করব?'

'কী?'

'আগে বল রাখবে?'

'না শুনে কী করে কথা দিই? আমার পক্ষে সম্ভব হলে নিশ্চয়ই রাখব।

'তোমার পক্ষে অসম্ভব না।'

'অনুরোধটা শোনাই যাক।'

'তুমি যেখানে যাচ্ছ, আমাকে সেখানে নেবে?'

'না-না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুদীপা। বলল, 'প্লীজ আমাকে ক্ষমা করো—' বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখল।

লাঞ্চের পর আর কোনো কনফারেন্স ছিল না আজ। নিজের চেম্বারে বসেই অজস্র ফাইল দেখল সুদীপা, অনেক দরকারী কাগজপত্রে সই করল, দু'চারজন ভিজিটরের সঙ্গে কথা-টথা বলল। তারপর ছুটি হতে এক সেকেন্ডও দেরি না করে সোজা নিচে নেমে এল। শোফার বিশাল পোর্টিকোর তলায় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সুদীপা উঠতেই ড্রাইভওয়ে দিয়ে সেটাকে বাইরের রাস্তায় নিয়ে গেল।

আর তখনই সুদীপা দেখতে পেল, ফুটপাথে অসীমা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে তুলে নিয়ে শোফারকে বলল, 'বাড়ি চল।'

অসীমা এক পলক সুদীপাকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিল। কেন সুদীপা তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে চলেছে, জানার কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু তা জিজ্ঞেস করা যায় না। দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।

সুদীপা হঠাৎ বলল, 'একটা বিশেষ দরকারে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। কিছু কথা আছে। অফিসেও বলা যেত কিন্তু সেখানে প্রচুর লোকজন। এমন জায়াগায় বসে কথাগুলো বলতে চাই যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না'।

অসীমা এতক্ষণে মুখ খুলল। আস্তে করে বলল, 'কনফিডেন্সিয়াল কথা?'

'খুব।'

একটু চিন্তা করে সুদীপা ফের বলল, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তবু বলছি বাড়ি গিয়ে যা বলব তা যেন কেউ জানতে না পারে। ব্যাপারটা তোমার আর আমার ভেতর থাকবে। কারণ—'

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অসীমা।

সুদীপা বলতে লাগল, 'কারণ, আমি একজনকে ফাঁদে ফেলতে চাইছি। জানাজানি হয়ে গেলে তাকে ধরতে পারব না।'

বাড়ি এসে সোজা তেতলায় নিজের ঘরে অসীমাকে নিয়ে এল সুদীপা। চা-টা খাওয়ার পর বলল, 'আচ্ছা, ডেইলি লিজার পার্সোনাল ফোন কী রকম আসে?'

অসীমা বলল, 'খুব একটা বেশি না। রোজ ওকে কেউ ফোন করে না। মাঝে মাঝে করে।

'ভাল করে ভেবে বল।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অসীমা বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ক'দিন ধরে এক ভদ্রলোক লিজাকে রেগুলার ফোন করছেন।'

'সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কখন করে?'

'তার কোনো ঠিক নেই।'

'ভদ্রলোকের নাম বলতে পারো?'

'নাম কী করে বলব?'

সুদীপা বলল, 'কে ফোন করছে না জেনে লাইন দাও নাকি?'

অসীমা বলল, 'আপনার আর রাহা সাহেবের ফোন এলে নাম জিজ্ঞেস করি। আপনারা কথা বলতে চাইলে তবে লাইন দিই। অন্যের বেলা কিছু জিজ্ঞেস করি না।'

'ভদ্রলোক লিজাকে কী বলে, কখনও শুনেছ?'

'না।'

'এখন থেকে লিজাকে কেউ ফোন করলে তার নাম জিজ্ঞেস করবে। ওরা কী বলে শুনবে। আর সেগুলো তক্ষুনি নোট করে নেবে। মনে থাকবে?'

আস্তে মাথা নাড়ল অসীমা।

সুদীপা বলল, 'ওদের কথাবার্তার যে নোট নেবে, আমাকে সেগুলো অফিসে দিও না। ছুটির পর আমাদের বাড়ি এসে দেবে।'

অসীমা বলল, 'আচ্ছা।'

সুদীপা বলল, 'তুমি হয়ত ভাবছ, কেন এভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের কথা শুনতে বলছি।'

অসীমা উত্তর দিল না।

সুদীপা বলতে লাগল, 'তুমি আমাকে নিশ্চয়ই অভদ্র, আনকালচারড বলবে— না?'

অসীমা বিব্রত মুখে বলে উঠল, 'না-না, সে কী!'

সুদীপা বলল, 'লিজা আর ঐ ভদ্রলোক যদি ওঁদের পার্সোনাল ব্যাপারে কথা বলতেন আমার মাথা ঘামবার কথা ছিল না। কিন্তু খবর পেয়েছি, ওঁরা এমন সব বিষয়ে কথাবার্তা বলছে, যার সঙ্গে আমার সম্মান, মর্যাদা আর ভবিষ্যৎ জড়িত। আপাতত এটুকু জেনে রাখো।'

অসীমা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

সুদীপা আবার বলল, 'আমাকে তুমি দিদি বল তো?'

অসীমা বলল, 'আপনি আমার দিদিই তো।'

'তা হলে দিদির মর্যাদা বা সুনাম নষ্ট হয়, এমন কিছু নিশ্চয়ই তুমি চাইবে না।

'কক্ষনো না। আপনি আমাদের ফ্যামিলিকে বাঁচিয়েছেন। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

সুদীপা অসীমার একটা হাত ধরে গভীর গলায় বলল, 'আমি জানি। দিদির সম্মান তোমার কাছে অনেক বড়।' একটু থেমে বলল, 'জানি এ কথা কখনও কাউকেই তুমি বলবে না। শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যেই থাকবে।'

'আমি কাউকে বলব না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

।। দশ ।।

দু'দিন বাদে অফিস ছুটির পর সার্কুলার রোডের একটা সাইটে গিয়ে একটা মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং তৈরির কাজ দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই সুদীপা দেখতে পেল নিচের ড্রইংরুমে বসে অসীমা উমাপ্রসাদ আর হেমনলিনীর সঙ্গে গল্প করছে। অনেকদিন অসীমারা এ বাড়িতে থেকে গেছে। মিষ্টি ব্যবহার এবং কৃতজ্ঞবোধের জন্য বাবা এবং ঠাকুমা দু'জনেই মেয়েটাকে খুব পছন্দ করেন, সেই সঙ্গে স্নেহও।

সুদীপা বুঝতে পারল, লিজা আর সেই অজানা লোকটার কথা নোট করে নিয়ে এসেছে অসীমা। নিজের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতে করতে দ্রুত ড্রইংরুমের দিকে চলে এল সে।

উমাপ্রসাদ দরজার দিকে মুখ করে বসে ছিলেন। তিনি প্রথম সুদীপাকে

দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন, 'তোর আজ এত দেরি হল যে রঞ্জু?'

দেরির কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে সুদীপা অসীমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কখন এসেছ?'

অসীমা বলল, 'ছুটির পরই।'

হেমনলিনী বললেন, 'সন্ধ্যার আগে আইছে। তর লগে কী কামের কথা আছে'।

সুদীপা অসীমাকে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় নিজের ঘরে অসীমাকে নিয়ে যেতে যেতে সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'চা-টা খেয়েছ?'

অসীমা বলল, 'হ্যাঁ দিদি। ঠাকুমা আর জ্যাঠামশাই কাছে বসে অনেক খাইয়েছেন।'

ঘরে এসে কোনরকম তাড়াহুড়ো করল না সুদীপা। ভেতরকার উত্তেজনাটা অসীমাকে বুঝতে দিল না। তাকে বসিয়ে প্রথমে বাথরুমে ঢুকে স্নান-টান করে, পোশাক বদলে অসীমার মুখোমুখি বসতে না বসতেই মুনেশ্বর চা এবং খাবার-টাবার দিয়ে গেল। চা বা খাবারের কথা বলতে হয় না। সে বাড়ি ফিরলেই ঠাকুমা পাঠিয়ে দেন।

সুদীপা একটা প্লেটে দুটো সন্দেশ তুলে অসীমার দিকে বাড়িয়ে দিল, 'খাও—'

অসীমা করুণ মুখে বলল, 'দিদি আমার গলা পর্যন্ত বোঝাই হয়ে আছে। আর খেতে হলে মরে যাব।'

প্লেটটা নামিয়ে রেখে সুদীপা বলল, 'আমি খাব আর তুমি বসে থাকবে, ইট লুকস অড। অন্তত চা তো খাবে?'

'আচ্ছা—'

'তা হলে একটু কষ্ট করে তোমার আর আমার জন্যে বানিয়ে নাও।'

ট্রে-তে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম রয়েছে। পট থেকে দু'টো কাপে লিকার এবং দুধ ঢেলে তাতে চিনি মিশিয়ে অসীমা একটা দিল সুদীপাকে, একটা নিজে নিল।

দ্রুত সামান্য কিছু খেয়ে, চায়ে আলতো চুমুক দিতে দিতে সুদীপা বলল, 'ঐ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু খবর আছে, তাই না?'

সুদীপা কোনো ব্যাপারের কথা বলছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। আস্তে মাথা নেড়ে অসীমা বলল, 'হ্যাঁ দিদি। সেই জন্যেই তো আপনাদের এখানে এসেছি।'

'সব টুকে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, এই যে—' বড় হ্যাণ্ডব্যাগের মুখ খুলে ভাঁজ-করা কাগজ বার করে সুদীপার হাতে দিল অসীমা।

ভাঁজ খুলে সুদীপা পড়তে লাগল।

'বেলা সাড়ে দশটায় লিজাকে এক ভদ্রলোক ফোন করেন। তখন সুদীপাদি কনফারেন্স রুমে ছিলেন। সুদীপাদির ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী নাম জিজ্ঞেস করতে ভদ্রলোক জানান তিনি মিস্টার দত্ত। লিজাকে লাইন দিয়ে আমি দু'জনের কথাবার্তা শুনতে থাকি। তাঁদের কথাবার্তা এখানে দেওয়া হল।

মিস্টার দত্ত ঃ কী হল, সেই ছেলেটির খবর কিছু জানতে পারলে?

লিজা ঃ না।

দত্ত ঃ খবরটা যেভাবেই হোক আমার চাই।

লিজা ঃ চেষ্টা তো করে যাচ্ছি।

দত্ত ঃ চেষ্টার কথা অনেকবার বলেছ। দু' মাসের ওপর তুমি ওখানে কাজ করছ। একটা সামান্য খবর বার করতে এত সময় লাগার কথা নয়। তিন দিন পর তোমাদের অফিস ছুটি হয়ে যাচ্ছে। এর ভেতর খবরটা আমার চাই।

লিজা ঃ আচ্ছা।

বিকেল তিনটে দশে আরেক ভদ্রলোক লিজাকে ফোন করেন। তখনও সুদীপাদি কনফারেন্স রুমে ছিলেন। ইনস্ট্রাকশান অনুযায়ী ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করতে জানা গেল তিনি মিস্টার পাকড়াশী। দু'জনের কথাবার্তা হুবহু এখানে দেওয়া হল।

পাকড়াশী ঃ আবার তোমাকে ফোন করলাম।

লিজা ঃ বলুন।

ঃ আজই আমি একটা খবর পেয়েছি 'বস' মিস মিত্র পূজোর ছুটিতে নর্থ বেঙ্গলে বেড়াতে যান। সঙ্গে কাউকে নেন না। শুধু পুজোর সময়ই না, বছরের অন্য সময়ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওখানে যান। আমার কী মনে হয় জানো?

ঃ কী?

ঃ ঐ বাচ্চাটা নর্থ বেঙ্গলের কোথাও রয়েছে।

লিজা উত্তর দেয় নি।

পাকড়াশী আবার বললেন ঃ তুমি কি জানো এবার তোমার 'বস' বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন কিনা?

লিজা ঃ সেদিন মৃন্ময়বাবুকে ফোনে বলছিলেন কোথায় যেন যাবেন।

পাকড়াশী ঃ মৃন্ময়বাবু? ও তোমার 'বসে'র সেই প্রেমিকটি?

ঃ হ্যাঁ। মৃন্ময়বাবুও তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন।

ঃ তারপর?

ঃ মিস মিত্র কিছুতেই রাজী নন। অনেক বার ভদ্রলোক রিকোয়েস্ট করলেন। মিস মিত্রের এক কথা, তাঁকে সঙ্গে নেবেন না। শেষ পর্যন্ত দুম করে লাইনটা কেটে দিলেন।

ঃ লিজা, আর আমার কোনো রকম সন্দেহ নেই—ছেলেটি নর্থ বেঙ্গলের কোথাও আছে। মৃন্ময়কে মিস মিত্র কেন নিতে চান নি জানো?

ঃ কেন?

ঃ যার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে তাকে কেউ নিজের জীবনের গোপন লজ্জার কথা জানায় না। একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

ঃ বলুন।

ঃ যেমন করে পার মিস মিত্রের সঙ্গে তোমাকে নর্থ বেঙ্গলে যেতে হবে।

ঃ তা কী করে সম্ভব? উনি তো কাউকেই সঙ্গে নিতে চাইছেন না।

ঃ অসম্ভবকে সম্ভব করার দায়িত্ব তোমার। সেই রকম কনট্রাক্টই তোমার সঙ্গে আমার হয়েছিল। সেই শর্তেই তুমি ওখানে চাকরি নিয়ে গেছ।

ঃ কিন্তু—

ঃ কোনো কিন্তু শুনতে চাই না।

লিজা উত্তর দিল না।

পাকড়াশী ঃ যদি মিস মিত্র তোমাকে না নেন, একটা কাজ করবে।

লিজা ঃ কী কাজ?

ঃ উনি কখন কোন ট্রেনে বা প্লেনে যান, গোপনে খবর নেবে। তারপর সেই ট্রেন বা প্লেনের টিকেট কেটে 'ফলো' করে যাবে। যদি টিকিট না পাও আমাকে জানাবে। ব্যবস্থা করে দেব।

ঃ আচ্ছা।

এরপর পাকড়াশী লাইন কেটে দিলেন।

এই সব কথাবার্তার তলায় অসীমা তার মন্তব্য এইভাবে লিখেছে ঃ আমার কোন রকম সংশয় নেই যে মিস্টার দত্ত এবং মিস্টার পাকড়াশী একই লোক। গলার স্বর শুনলেই তা বোঝা যায়। কেউ যাতে সন্দেহ না করে, সেই জন্য দু'বার আলাদা আলাদা নাম বলেছেন তিনি।

কাগজটা ফের ভাঁজ করতে করতে সুদীপা বলল, 'একসেলেন্ট। দারুণ কাজ করেছ।' একটু থেমে বলল, 'ঠিক কমেন্ট করেছ। লোকটা খুবই চতুর।

উত্তর না দিয়ে সুদীপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অসীমা। সুদীপা বলল, 'অনেক রতে হয়ে গেল। নিচে চল, ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

অসীমা বলল, 'গাড়ির দরকার নেই। আমি বাস-টাসে চলে যেতে পারব।

সুদীপা তার কথা শুনল না; নীচেএসে গাড়িতে তুলে দিয়ে আবার ওপরে উঠে এল। বিছানায় শুয়ে চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে ভাবতে লাগল, এবার কী করা যায়। ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ব্যাপার তার মাথায় এসে গেল।

পরের দিন দুপুরে মুখোমুখি বসে লাঞ্চ খেতে খেতে সুদীপা লিজাকে বলল, 'তোমার মা এখন কেমন আছেন?'

লিজা বলল, 'ভালো ম্যাডাম। তবে এখনও বেশ উইক।'

'তোমার এক মাসীমা তোমাদের বাড়ি এসে আছেন না?'

'হ্যাঁ। আরো কয়েক দিন থাকবেন।'

সুদীপা একটু ভেবে বলল, 'এবার পুজোর ছুটিতে কী করছ? আই মীন বাইরে-টাইরে যাচ্ছ?'

'না।'

'একটা রিকোয়েস্ট করব—'

খেতে খেতে মুখ তুলে তাকাল লিজা।

সুদীপা বলল, 'আমি কলকাতার বাইরে ক'দিনের জন্য—এই ধরো ফর সেভেন ডেজ—বেড়াতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাবে? অবশ্য যদি তোমার কোনো অসুবিধা না হয়—'

লিজা ভেতরে ভেতরে চমকেই উঠল। তবে বাইরে চমকটা বেরিয়ে আসতে দিল না। কাল সেই ফোনটা আসার পর থেকে সে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না, কিভাবে সুদীপার সঙ্গে যাবে, বা তাকে 'ফলো' করবে। অভাবনীয় সুযোগটা এসে যাওয়ায় সে যতটা অবাক, তার চাইতে অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রবল শক্তিতে বিস্ময় এবং উত্তেজনাটা সামলে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমার কোনো অসুবিধা নেই। আপনার সঙ্গে গেলে বাবা-মা খুশিই হবেন। আমারও ভীষণ ভালো লাগবে।'

'গুড। আজ বৃহস্পতিবার। শনিবার অফিস হয়ে ছুটি পড়ে যাবে। রবিবার আমরা বেরিয়ে পড়ব। সাড়ে দশটায় ট্রেন। স্যুটকেস-ট্যাটকেস গুছিয়ে ন'টার ভেতর আমাদের বাড়ি আসতে পারবে? না স্ট্রেট স্টেশনে চলে যাবে?'

'আমি স্টেশনেই চলে যাব।'

'ঠিক আছে। লাঞ্চের পর আমাদের ট্রাভেল এজেন্টকে ফোনে বলে দাও, রবিবারের দার্জিলিং মেইলে তোমার আমার জন্যে যেন একটা 'কুপ' রিজার্ভ করে।'

'আচ্ছা।'

।। এগারো ।।

লিজাকে নিয়ে প্রথমে শিলিগুড়ি এল সুদীপা। তাদের ট্রাভেল এজেন্ট আগেই এখানকার থ্রি-স্টার 'হোটেল স্নো অ্যাণ্ড সানে' স্যুইট 'বুক' করে রেখেছে।

এই হোটেলটা সুদীপার খুবই পছন্দ। নর্থ বেঙ্গলে এলেই সে এখানে ওঠে। বছরে তিন-চার বার আসার জন্য প্রোপ্রাইটর, ম্যানেজার থেকে শুরু করে ফ্লোর বয় পর্যন্ত সবাই তাকে দারুণ খাতির করে। তার আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সবার তীক্ষ্ণ নজর। এখানে বেস্ট সারভিস পেয়ে থাকে সে।

সন্ধ্যেবেলা শিলিগুড়ি পৌঁছেছিল সুদীপারা। হোটেলে যেতেই রিসেপশানের দারুণ স্মার্ট তরুণীটি বলল, 'কেমন আছেন ম্যাডাম?'

'ফাইন। তোমরা?' বলে হাসল সুদীপা।

'ভাল আছি।'

'আমার স্যুইট?'

'রেডি।'

'চারতলায় সাউথ ফেসিং সেই স্যুইটটা দিয়েছ তো?'

'নিশ্চয়ই। পুজোর সময় ওটা আপনার জন্যেই রেখে দিই। অন্য কাউকে দিই না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

রিসেপশানিস্ট মেয়েটি একটা বয়কে ডেকে সুদীপা এবং লিজার মালপত্র চারতলার স্যুইটে পাঠিয়ে দিল। তারপর বলল, 'ম্যাডাম, কাল সকালে আপনার গাড়ির দরকার হবে কি?' এই হোটেলের সবাই জানে সুদীপা যেদিন এখানে আসে তার পরের দিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যায়, তারা জানে। তবে কেন যায়, সেটা বলতে পারবে না।

সুদীপা বলল, 'নিশ্চয়ই। কাল ব্রেকফাস্টের পরই চাই কিন্তু।'

'পাবেন। আজই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখব।'

আরেক বার ধন্যবাদ জানিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল সুদীপা। তার পেছনে পেছনে লিজা।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে স্যুটকেস থেকে বিরাট দুটো প্যাকেট বার করল সুদীপা। দেবাশীসের জন্য দামী নতুন জামা-প্যান্ট, চকোলেটের বাক্স, ছবির বই, স্ট্যাম্পের বই ইত্যাদি কিনে এনেছে সে।

দুটো বেডরুম আর একটা ড্রইংরুম নিয়ে সুদীপাদের বিশাল স্যুইট। ড্রইংরুম থেকে চোখের কোণ দিয়ে লিজা সুদীপাকে লক্ষ্য করছিল। সে জানে না, সুদীপাও তার দিকে নজর রেখেছে।

প্যাকেট দুটো নিয়ে ড্রইংরুমে এল সুদীপা। বলল, 'চল লিজা—' কালই লিজাকে সে জানিয়ে রেখেছিল, আজ সকালে বেরুবে। সে যেন সাড়ে সাতটার ভেতর রেডি হয়ে নেয়। কথামতো রাতের পোশাক-টোশাক বদলে সাড়ে সাতটার অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে সে।

লিজা উঠে দাঁড়াল। তারপর সুদীপার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে নিচে এসে গাড়িতে উঠল।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে মাদার মেরি অরফ্যানেজে ওরা পৌঁছে যায়। ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক গির্জার পাশে তাঁর ছোট্ট লাল বাড়িটায় ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে লিজাকে নিয়ে সোজা সেখানে চলে আসে সুদীপা। ফাদারকে প্রণাম করতেই দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরে গভীর স্নেহে বলেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড। বোসো—'

দেখাদেখি লিজাও ফাদারকে প্রণাম করল। তাকেও আশীর্বাদ করে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বললেন, 'একে তো চিনতে পারলাম না।'

লিজা বলল, 'আমি এলিজাবেথ; সবাই লিজা বলে। ম্যাডামের অফিসে আমি কাজ করি।'

'ও আচ্ছা।'

সুদীপা এবার বলল, 'ফাদার দেবাশিসকে একবার—' এই পর্যন্ত বলেই চুপ করে গেল।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ওকে নিয়ে আসছি।' তিনি আর দাঁড়ালেন না, বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক দেবাশিসকে নিয়ে ফিরে এলেন। দেবাশিসের বয়স এখন বারো কি তেরো। কোঁকড়া চুল, নমনীয় মুখ, টকটকে ফর্সা রঙ, মায়ামাখানো চোখ।

সুদীপাকে দেখে মুখটা আলো হয়ে উঠল দেবাশিসের। খুব খুশি হয়ে বলল, 'তুমি এসেছ আণ্টি!'

সুদীপা তাকে কাছে বসিয়ে বলল, 'তুমি ভালো আছ তো?'
'হ্যাঁ।'
'এই নাও—' বলে সেই প্যাকেট দুটো তার হাতে দিল সুদীপা।
প্যাকেট খুলে তক্ষুনি নতুন জামা-প্যাণ্ট, চকোলেটের বাক্স ইত্যাদি বার করল দেবাশিস। 'কি সুন্দর জামা, কি সুন্দর প্যাণ্ট?'
'তোমার পছন্দ হয়েছে?'
'হুঁ—' দেবাশিস ঘাড় হেলিয়ে দিল।
দেবাশিসের সঙ্গে গল্প করতে করতে সুদীপা লিজার ওপর নজর রেখে যাচ্ছিল। লিজা পলকহীন, দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে আছে।
অনেকক্ষণ দেবাশিস আর ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কের সঙ্গে গল্প-টল্প করল সুদীপা। ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক চা কেক-টেক আনিয়ে দিয়েছিলেন। সে-সব খাওয়াও হল। তারপর ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শিলিগুড়িতে ফিরে গেল সুদীপা।
শিলিগুড়িতে ওরা দিন সাতেক ছিল। রোজই সকালে লিজাকে সঙ্গে করে মাদার মেরি অরফ্যানেজে চলে যেত সুদীপা। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে বিকেলে হোটেলে ফিরত।
সাতদিন পর ট্রেনে কলকাতায় ফিরতে ফিরতে সুদীপা বলল, 'পুজোর ছুটিতে তো নিশ্চয়ই, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু সময় করতে পারলেই আমি শিলিগুড়িতে চলে আসি। যে ক'দিন ওখানে থাকি, রোজ মাদার মেরি অরফ্যানেজে যাই। কেন জানো?'
লিজার মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। খুব সরল গলায় সে বলল, 'কেন?'
'দেবাশিসকে দেখতে।'
লিজা সামান্য কৌতূহলও প্রকাশ করল না। চুপচাপ তাকিয়ে রইল।
লিজাকে দেখতে দেখতে সুদীপার মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছিল যেন। এই মেয়েটা কোন এক চ্যাটার্জি বা মুখার্জি বা দত্ত বা পাকড়াশীর সঙ্গে তার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে চলেছে। দেবাশিসের খবরটা পাওয়া মাত্র নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেইল শুরু করবে। অথচ এই মুহূর্তে তাকে দেখলে সে কথা বোঝার উপায় নেই। মুখে চোখে পবিত্র স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়ে লিজা বসে আছে।
এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। কলকাতায় গিয়ে কৌশলে লিজাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। লিজা ধরা পড়লে সেই আসল শয়তান ব্ল্যাকমেইলারটাকে ফাঁদে ফেলতে পুলিশের দু'দিনও লাগবে না। জেরা করে

করে তার নাম-টাম ঠিক ওরা বার করে ফেলবে।

প্রাণপণে রাগ এবং উত্তেজনাটা সামলে সুদীপা বলল, 'দেবাশিসকে না দেখে আমি থাকতে পারি না।'

লিজা আধফোটা গলায় শুধু বলল, 'ও।'

কলকাতায় ওরা পৌঁছুল পরের দিন ভোরে। স্টেশনে নেমে সুদীপা বলল, 'আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ি একটু আসতে পারবে?'

সুদীপার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লিজা। তারপর বলল, 'পারব।'

প্লীজ এসো। তোমার সঙ্গে খুব দরকারী একটা কথা আছে।'

'আসব।'

বাড়িতে এসেই পুলিশে খবর দিয়ে রেখেছিল সুদীপা। সন্ধ্যেবেলা প্লেন ড্রেসে একজন পুলিশ অফিসার এবং তাঁর দু'জন সহকারী এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ব্যবস্থায় কোথাও কোনো ফাঁক নেই। রাত এগারোটা পর্যন্ত সবাই শিরদাঁড়া টান করে বসে রইল। কিন্তু লিজা এল না।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'লিজার বাড়ির ঠিকানা কী?'

সুদীপা বলল, 'আমি ঠিক জানি না। শুনেছি পার্ক সার্কাসের ওদিকে কোথাও থাকে। অফিসে অ্যাড্রেস লেখা আছে।'

'অ্যাড্রেসটা পাওয়া যেতে পারে?'

'এখন তো অফিস বন্ধ। খুলবে আরো এক উইক পর।'

'ঠিকানাটা যে এক্ষুনি চাই—'

কিছুক্ষণ ভেবে সুদীপা বলল, 'আমাদের পার্সোনেল অফিসারকে ফোন করে দেখি যদি উনি বলতে পারেন। অবশ্য ছুটিতে কলকাতায় আছেন কিনা—'

টেলিফোনে পার্সোনেল অফিসারকে পাওয়া গেল। লিজার ঠিকানা তিনি বলতে পারলেন। ১০।৭।এফ, মোজেস লেন. পার্ক সার্কাস।

পুলিস অফিসাররা তখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এক ঘণ্টা পর সুদীপা একটা ফোন পেল।

'মিস মিত্র, আমি চট্টরাজ বলছি—'

চট্টরাজ অর্থাৎ সেই পুলিশ অফিসারটি। সুদীপা গভীর আগ্রহের গলায়

বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। খবর পেলেন?'

'না। মোজেস লেন একটা পেয়েছি ঠিকই। তবে ঐ রকম কোনো বাড়ির নাম্বার নেই; এলিজাবেথ স্যাণ্ডার্স বলেও কাউকে পাওয়া গেল না। আমার মনে হয়, নাম আর অ্যাড্রেস, দুটো ফিকটিসাস—জাল।'

'তবু ভালো করে একটু খুঁজে দেখুন।'

'নিশ্চয়ই।'

একটা সপ্তাহ গোটা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলল পুলিশ কিন্তু লিজা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

সাত দিন পর অফিস যেদিন খুলল সেদিনই লিজার রেজিগনেসন লেটার পেল সুদীপা। নবজীবন হাউসিং কনসার্নে সে আর চাকরি করবে না।

।। বারো ।।

একমাস বাদে হঠাৎ আরেকটা চিঠি পেল সুদীপা। নর্থ বেঙ্গল থেকে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক জানিয়েছেন, এক ভদ্রলোক দেবাশিসকে দত্তক নিয়ে চলে গেছেন।

চিঠিটা পড়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সুদীপা। মনে হল হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে গেছে। তারপর ভাঙা গলায় ফোন তুলে অসীমাকে মাদার মেরি অরফ্যানেজে লাইন দিতে বলল।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে লাইন পাওয়া গেল। ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কই ধরেছেন। বললেন, 'কী ব্যাপার মাই চাইল্ড?'

সুদীপা বলল, 'দেবাশিসকে আপনি দত্তক দিয়ে দিলেন?'

'এটা নতুন কিছু নয়। তুমি তো জানোই প্রত্যেক বছর এখান থেকে কত ছেলেকে লোকে দত্তক নিয়ে যায়।'

কথাটা ঠিক। ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক সুদীপাকে অনেকবার তা জানিয়েছেন। সে বলল, 'কে দত্তক নিল?'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বললেন, 'এ প্রশ্নটা আমাকে কোরো না।'

'কেন?'

'আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সুদীপা। তার নাম বলতে পারব না।'

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বলল, 'দেবাশিসকে দত্তক দিলেন অথচ আমাকে জানালেন না!'

ফাদার বললেন, 'উপায় ছিল না মাই চাইল্ড।'

'কেন?'

'যিনি দেবাশিসকে জন্মের পর আমাদের এখানে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বারণ ছিল।'

সুদীপা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেলল, 'আমার যে কিছুই রইল না ফাদার।'

ফেয়ারব্যাঙ্ক বললেন, 'কেঁদো না মাই চাইল্ড। কেঁদো না। মনে শক্তি আনো, ধৈর্য আনো। গড ব্লেস ইউ।'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক ফোন নামিয়ে রাখলেন।

।। তেরো।।

আরো কয়েক মাস কেটে গেল।

এর মধ্যে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে দেবাশিসের খোঁজে লাগিয়েছিল সুদীপা কিন্তু হাজার দুয়েক টাকাই গেল। তারা দেবাশিসকে বার করতে পারে নি।

পুলিশও লিজার পেছনে লেগে আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তার খোঁজও পাওয়া যায় নি। সুদীপার ভয় ছিল যে কোন মুহূর্তে ব্ল্যাকমেল শুরু হয়ে যেতে পারে। সেটা অবশ্য হয় নি।

এর মধ্যে মৃন্ময় সব সময়ই তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। রোজই সে তাকে ফোন করেছে, মাঝে মাঝে তার অফিসে বা বাড়িতে চলে এসেছে। দু'-একবার বিয়ের ব্যাপারে জানতেও চেয়েছে মৃন্ময় কিন্তু সুদীপা এখনও মনঃস্থির করতে পারে নি। যত দিন যাচ্ছে অদ্ভুত এক শূন্যতা এবং বিষাদ তাকে যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে।

বিষণ্নতা কাটাবার জন্য ইদানীং দিনরাতই কাজে ডুবে থাকে সুদীপা। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ে। সাইটে সাইটে ঘুরে অফিসে যায়। ছুটির পর আবার নতুন বিল্ডিং তৈরির সাইটে। বাড়ি ফেরে গাদা গাদা ফাইল নিয়ে। অনেক রাত পর্যন্ত কোম্পানির হিসাব-টিসাব দ্যাখে বা নতুন সব বাড়ির নকশা আঁকে।

এত কাজের ভেতরও 'ইমপোর্ট এক্সপোর্ট' কোম্পানির সেই বাড়িটা সম্পর্কে তার আগ্রহ সব চাইতে বেশি। ওঁরা চেয়েছিলেন, এক বছরের মধ্যে বাড়িটা কমপ্লীট হোক। যেভাবে কাজ চলছে তাতে দশ মাসের বেশি লাগবে বলে মনে হয় না। অন্য 'সাইটে' দু'-একদিন পর পর যায় সুদীপা কিন্তু এই বাড়িটার 'সাইটে' তার রোজ একবার করে যাওয়া চাই।

অবিকল তাদের বাড়ির মডেলে এই বাড়িটা কে বানাচ্ছেন তা জানার

জন্য প্রথম থেকেই সুদীপার অপরিসীম কৌতূহল। তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে কথা বলার খুবই ইচ্ছে তার। কিন্তু ইচ্ছা পূরণটা কিছুতেই হচ্ছে না। 'ইমপোর্ট-এক্সপোর্টে'র রিপ্রেজেন্টেটিভ অবিনাশ সাধুখাঁকে যখনই জিজ্ঞেস করে তখনই উত্তর পাওয়া যায়—তাঁদের মালিক কলকাতায় নেই। ব্যবসার কাজে হয় দিল্লী গেছেন, নতুনা বম্বে কিংবা লণ্ডন, নিউইয়র্ক বা মিডল ইস্টে। অনেক চেষ্টা করেও ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় নি। অবশ্য ক্লায়েন্ট হিসেবে তিনি চমৎকার। চুক্তি অনুযায়ী মিয়মিত চেক পাঠিয়ে যাচ্ছেন।

ঠিক দশ মাস দু' দিনের মাথায় 'ইমপোর্ট এক্সপোর্টে'র বাড়িটা শেষ হয়ে গেল। আর তার পরদিনই অবিনাশ সাধুখাঁ লাস্ট ইনস্টলমেন্টের চেক নিয়ে সুদীপার সঙ্গে দেখা করলেন। চেকটা তাকে দিতে দিতে অবিনাশ বললেন, 'আমাদের ফুল পেমেন্ট হয়ে গেল।'

ভদ্রলোক আগে কখনও সুদীপার কাছে চেক নিয়ে আসেন নি; তাদের কালেকসান ডিপার্টমেন্টে জমা দিয়েছেন। সুদীপা একটু অবাকই হল। পরক্ষণে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি তো এ সব পেমেন্টের ব্যাপার দেখি না। আমাদের কালেকসান ডিপার্টমেন্ট—'

তার কথা শেষ হবার আগেই অবিনাশ বলে উঠলেন, 'জানি। আগের চেকগুলো ওখানেই দিয়ে গেছি। তবে—'

'তবে কী?'

'আমাদের মালিকের ইনস্ট্রাকসান শেষ চেকটা যেন আপনার হাতেই দিই। সেই সঙ্গে এটাও দিতে বলেছেন।' অবিনাশবাবু তাঁর ঢাউস ব্যাগ খুলে একটা বিরাট খাম বার করে সুদীপাকে দিলেন।

সুদীপা বলল, 'কী এটা?' তার বিস্ময় ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল।

অবিনাশ বললেন, 'ইনভিটেশন কার্ড।'

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কীসের?'

বিনীত ভঙ্গিতে অবিনাশ বললেন, 'দয়া করে খুলে দেখুন—

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল সুদীপার। নকশা-করা সুদৃশ্য খামটার ওপর চমৎকার হস্তাক্ষরে তার নাম লেখা আছে। কোনরকম ব্যস্ততা-না দেখিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছাপানো সুন্দর কার্ড বার করল। ইংরেজিতে তাতে যা লেখা আছে তর্জমা করলে তা এইরকম দাঁড়ায়।

'আগামী পনেরই আগস্ট সকাল দশটায় আমাদের নতুন বাড়িতে

গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই শুভদিনে অনুগ্রহপূর্বক আপনি আসিলে আমরা কৃতার্থ হইব এবং আমাদের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গশোভন হইয়া উঠিবে। ইতি, বিনীত 'ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপোর্ট এজেন্সি।'

কার্ড থেকে মুখ তুলতেই অবিনাশ বললেন, 'আমাদের মালিক বিশেষ করে গৃহপ্রবেশের দিন আপনাকে যেতে বলেছেন। উনি নিজে এসে বলতে পারলেন না বলে ক্ষমা চেয়েছেন। হঠাৎ বাইরে যেতে হল কিনা, তাই আসতে পারেন নি।'

এর আগেও সুদীপারা যে সব ক্লায়েন্টদের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে তারা সবাই গৃহপ্রবেশের দিন তাদের নিমন্ত্রণ করেছে। ফলে অবিনাশ যে ইনভিটেশন কার্ড নিয়ে এসেছেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে সুদীপা গিয়ে থাকে। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা পার্সোনাল কনট্যাক্টটা তাদের কোম্পানির স্বার্থেই দরকার। তবু অবিনাশের ব্যাপারটা অনেকখানি আলাদা। সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের মালিক কোথায় গেছেন?'

'আবু ধাবি।'

'কিন্তু আজ হল টুয়েলভথ্ আগস্ট। ফিফটীনথ গৃহপ্রবেশ। এর ভেতর কি উনি আসতে পারবেন?'

'উনি চোদ্দ তারিখের রাত্তিরে কলকাতা পৌঁছে যাবেন।'

'ও আচ্ছা।'

'গেস্টরা আসবেন, আর উনি থাকবেন না—তা তো হয় না। তা ছাড়া এত যত্ন করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটা করে দিয়েছেন। মালিক খুব খুশী। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ওঁরও ভীষণ আগ্রহ। এতদিন কিছুতেই যোগাযোগটা হচ্ছিল না। গৃহপ্রবেশের সুযোগে হবে।'

সুদীপা কিছু বলল না।

অবিনাশ বললেন, 'আপনি আসছেন—আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত রইলাম ম্যাডাম।'

সুদীপা আস্তে বলল, 'আচ্ছা—'

পনের আগস্ট কাঁটায় কাঁটায় দশটায় 'ইমপোর্ট এক্সপোর্টে'র নতুন বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থেকে নামল সুদীপা।

দশ মাস ধরে এখানে রোজ একবার দু'বার করে এসেছে সে। এ বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি তার নিজের হাতে গড়া। বাড়িটা তাদের বাড়ির মডেলে তৈরি বলে দারুণ প্যাসান দিয়ে কাজ করেছে সে।

আজ গথিক স্ট্রাকচারের এই বিশাল বিল্ডিংটাকে যেন চেনাই যায় না।

অজস্র ফুলপাতা, চাঁদমালা আর টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। দিনের বেলা বলে লাইটগুলো জ্বলছে না।

গেটের কাছে নহবত বসানো হয়েছে। সিন্ধ মিঠে সুরে সানাই বাজছে সেখানে।

অবিনাশ সাধুখাঁ কোথায় ছিলেন, কে জানে। হঠাৎ দৌড়ে কাছে এসে হাতজোড় করে বললেন, 'আসুন ম্যাডাম, আসুন—' সুদীপাকে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

সুদীপা কিছু বলল না।

ভেতরে লনে ডেকরেটররা প্যাণ্ডেল বানিয়েছে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা কাচের সুন্দর সুন্দর ঝাড়লণ্ঠন লাগিয়েছে। গেস্টদের বসবার জন্য চারদিকে অগুনতি সোফা আর সেন্টার টেবিল। প্যাণ্ডেলের খুঁটিগুলো রঙিন কাপড় দিয়ে ঢেকে থোকা থোকা ফুল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপর ঝকঝকে নতুন সব ফ্যান।

এত বিপুল আয়োজন কিন্তু সুদীপা ছাড়া আর কোন গেস্টকেই দেখা যাচ্ছে না। প্যাণ্ডেলটা একেবারেই ফাঁকা। তবে বাড়ির কাজের লোকজন এবং ডেকরেটরদের কিছু কিছু লোক এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

সুদীপা প্যাণ্ডেলের দিকে যাচ্ছিল, অবিনাশ ব্যস্তভাবে বললেন, 'ওদিকে না ম্যাডাম, আমার সঙ্গে আসুন—'

সুদীপাকে সঙ্গে করে অবিনাশ বাড়ির ভেতরে চলে এলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। সমস্ত সিঁড়ি দামী লাল কার্পেট মোড়া।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, আমি একাই আপনাদের গেস্ট নাকি?'

'আজ্ঞে না ম্যাডাম—' অবিনাশ বললেন, 'সকালে মোটে তিন-চারজনকে ইনভাইট করা হয়েছে, অন্যদের বিকেলে।'

সুদীপা মজা করে বলল, 'আমি তা হলে স্পেশাল গেস্ট—কি বলেন?'

অবিনাশ সামান্য হাসল।

সুদীপা আবার বলল, 'আপনাদের মালিককে দেখছি না তো?'

'তিনি তেতলায়। আর দু'জন গেস্টের সঙ্গে কথা বলছেন। আমার ওপর ইনস্ট্রাকসান আছে আপনি এলেই যেন ওপরে নিয়ে যাই।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না সুদীপা। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে অদ্ভুত এক উত্তেজনা আর কৌতূহল অনুভব করতে লাগল।

তেতালায় একটা ঘরের দরজায় দামী নীলাভ পর্দা ঝুলছে। সেখানে এসে

দাঁড়িয়ে গেলেন অবিনাশ। ভেতরে কারো উদ্দেশে বললেন, 'স্যার, উনি এসে গেছেন—'

ঘরের ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'ওঁকে আসতে বলুন—'

এবার সুদীপার দিকে ফিরলেন অবিনাশ। বললেন, 'যান ম্যাডাম—'

সুদীপা বলল, 'আপনি যাবেন না?'

'না। আমার অনেক কাজ আছে।' অবিনাশ আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন।

সুদীপা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই থমকে যেতে হল। মনে হল, রক্তপ্রবাহ বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু খেলে যাচ্ছে। সমস্ত অস্তিত্ব যেন প্রবল ঝড়ে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে রণবীর দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক, লিজা এবং দেবাশিস।

কত কাল পরে রণবীরকে দেখল সুদীপা! তার সঙ্গে শেষ দেখা কোর্টরুমে। তখন তার চেহারা ভেঙেচুরে গেছে। চোখ দু' আঙুল গর্তে ঢোকানো। মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি।

আর আজ যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার চেহারা কত ব্রাইট! চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখমুখ উজ্জ্বল, পরনে দামী পোশাক। দেখেই বোঝা যায়, জীবনে সে সবদিক থেকেই কৃতী এবং সফল।

স্তব্ধ মূর্তির মতো সুদীপা তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে।

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'মাই চাইল্ড, সেদিন তোমাকে বলতে পারি নি। বলার সময়ও সেটা নয়। আজ বলছি, দেবাশিসকে রণবীরের হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, এই পৃথিবীতে এর চাইতে বড় আশ্রয় তার আর কোথাও নেই। তুমি রণবীরের সঙ্গে কথা বল মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। গড ব্লেস ইউ।'

ওধার থেকে লিজাও কাছে এগিয়ে এল। হাতজোড় করে বলল, 'ম্যাডাম, মিস্টার মুখার্জিই আমাকে আপনার অফিসে পাঠিয়েছিলেন। যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা করবেন। আমার বিশ্বাস আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নি। আপনার যাতে ভালো হয়, আপনার সব দুঃখ যাতে ঘোচে, সেই চেষ্টাই করেছি।'

ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক বা লিজার কথা কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না সুদীপা। শুনলেও তার মাথায় ঢুকছে না। পলকহীন রণবীরের দিকে সে

তাকিয়েই আছে।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, হঠাৎ সুদীপা লক্ষ্য করল, আশেপাশে ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্ক লিজা বা দেবাশিস—কেউ নেই। কখন তারা বেরিয়ে গেছে, কে জানে। এ ঘরে এখন শুধু রণবীর আর সে।

এক সময় রণবীর কাছে এসে দাঁড়াল। গাঢ় কাঁপা গলায় ডাকল, 'রঞ্জু—'

সুদীপা উত্তর দেয় না। তাকিয়েই থাকে।

রণবীর আবার বলে, 'তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমার জন্যে তোমার দুঃখ আর অসম্মানের শেষ ছিল না।

সুদীপা চুপ।

রণবীর বলতে থাকে, 'তোমার বাবা যে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন—ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। জোর করে তোমাকে পেতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পৃথিবীতে সব কিছু পাওয়া কি এত সহজ! তোমার বাবা আমাকে জেলে পাঠিয়ে উপকারই করেছেন।'

সুদীপা এখনও কিছু বলল না।

রণবীর থামে নি, 'জেল থেকে বেরিয়ে তোমার খোঁজ করলাম। তারপর বিজনেসে নামলাম। লাকই বলতে পার, কয়েকটা বড় বড় সুযোগ এসে গেল।

সেগুলো কাজে লাগাতেই বিজনেসটা দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এই বাড়িতে হাত দিলাম, দেবাশিসকে অরফ্যানেজ থেকে নিয়ে এলাম। এ সবের পেছনে রয়েছে আমার একটাই আশা, একটাই স্বপ্ন। তুমি কি বুঝতে পেরেছ রঞ্জু?' বলতে বলতে গলা বুজে আসতে লাগল রণবীরের।

সুদীপা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার সমস্ত শরীর যেন টলছে।

রণবীর অবরুদ্ধ গলায় বলতে লাগল, 'জানি, এ আমার দুরাশা। হয়ত—হয়ত—'

রণবীরের কথা শেষ হবার আগেই তার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে প্রবল উচ্ছ্বাসে অভিমানী বালিকার মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সুদীপা। আর অনুভব করতে লাগল, রণবীর প্রগাঢ় মমতায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এত দিন কত মানুষের বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে সুদীপা। কিন্তু তার নিজের জন্য কোথাও ঘর ছিল না। এই যেন প্রথম তার গৃহপ্রবেশ ঘটল।